রাষ্ট্রীয় জীবনচরিতমালা

কবীর

পারসনাথ তিবারী

অনুবাদক

শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

নয়া দিল্লী

KABIR

(Bengali)

আগস্ট ১৯৬০

সচিব, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, নয়া দিল্লী-১৩ কর্তৃক প্রকাশিত এবং নব মুদ্রণ প্রাইভেট লিমিটেড, ১৭০এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

প্রস্তাবনা

প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশে জীবনের নানা ক্ষেত্রে অসাধারণ সব মানুষ আবির্ভূত হয়েছেন। আমাদের ইতিহাসে এই মহামানবদেরই নামের শোভাযাত্রা। তাঁদেরই সুমহান দানে অভিষিক্ত হয়েছে আমাদের কলা, সাহিত্য, রাজনীতি, বিজ্ঞান এবং অন্যান্য বিদ্যার ক্ষেত্র। এই মনীষীদের অনেকেরই নামমাত্র আমরা জানি, কিন্তু তাঁদের জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি সামান্য। এই দেশে জন্ম নিয়ে কয়েকজন মহাপুরুষ অসাধ্যসাধন করেছেন, কিন্তু দেশের জনগণ তাঁদের ভালো করে জানেন না।

দেশের ইতিহাস অনেকাংশে দেশের মানুষেরই ইতিহাস। কারণ, মানুষই দেশকে গড়েছে, দেশের শ্রীবৃদ্ধি ও বিকাশ সাধন করেছে। দেশের সকল সম্পদ-বিভবের কথা দেশবাসীর জানা থাকা প্রয়োজন। এবং সেই বিভবের স্রোত যে-সমস্ত মানুষের চরণ ছুঁয়ে প্রবাহিত হয়েছে— তাঁদের সম্বন্ধেও সম্যক্ জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

এ-রকম উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো কোনো দেশে, জীবনী-সংগ্রহ' পর্যায়ের বই প্রকাশিত হয়েছে; কিন্তু আমাদের দেশে এতদিন এই ধরণের কোনো বস্তুর প্রয়োজন বড় একটা কেউ উপলব্ধি করেননি।

এই 'জীবনচরিতমালা' প্রকাশের উদ্দেশ্য— সহজ, সরল এবং রুচিসম্মত ভাষায় দেশের স্মরণীয় নরনারীর জীবনী রচনা করে দেশের সাধারণ পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া— পূর্ণাঙ্গ পুস্তক প্রকাশে পাণ্ডিত্য প্রদর্শন নয়। দেশের বিচিত্র

প্রস্তাবনা

জীবন-চরিত ভিন্ন ভিন্ন ভাগে সংকলন করে একটি সময়োপযোগী 'জীবনী-সংগ্রহ' প্রকাশ করাই আমাদের অভিপ্রায়।

আমি অধ্যাপক কে. স্বামীনাথন এবং শ্রীমহেন্দ্র দেশাই-এর প্রতি কৃতজ্ঞ; কারণ তাঁরা এই চরিতমালা সম্পাদনের ভার গ্রহণ করেছেন। ইতি—

বালকৃষ্ণ কেসকর

জীবন-চরিত

আজ থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচশ বছর আগের কথা। কাশীর নিকটবর্তী 'লহরতারা' গ্রামে নীরু জোলা থাকত। সে নীমা নামে একটি মেয়েকে বিয়ে করল। বিয়ের পর সে যখন বউকে নিয়ে দ্বিরাগমন থেকে ফিরছিল তখন পথে এক নির্জন জায়গায় একটি সদ্যোজাত শিশুকে দেখতে পায়। অসহায় অবস্থায় পড়ে থাকা এই শিশুটিকে তারা তুলে নিতে চাইল; কিন্তু প্রথমটা শিশুটির গায়ে হাত দিতেই ইতস্ততঃ করছিল। কারণ ধর্ম, লোকাচার প্রভৃতি এসে তাদের পথ আটকে দাঁড়াল। শিশুটি এত সুন্দর যে ওকে ফেলে যেতেও তাদের মন চাইছিল না, আবার ওকে সঙ্গে নিয়ে গেলেও কী বিপদ ঘটবে— এ সমস্ত আকাশ-পাতাল ভাবনার মাঝে মাঝে নীরু আর নীমার মধ্যে বেশ কিছু কথা কাটাকাটিও হল। লোক-নিন্দার ভয়ে নীরু শিশুটিকে নিতে চায়নি, কিন্তু নীমা সে-কথা শুনল না; তার সন্তানবাৎসল্য কোনো বাধাই মানল না। শেষ পর্যন্ত লোকলজ্জা তুচ্ছ করে শিশুটিকে তারা কোলে তুলে নিয়ে চলল। কাশীধামের যে-অঞ্চলটি আমাদের চরিত-নায়কের নামানুসারে 'কবীর-চৌরা' বলে এখন প্রসিদ্ধ ঠিক সেখানেই নীরু জোলার বাড়ি ছিল বলে শোনা যায়। ওই অঞ্চলটি আজকাল 'নীরুতলা' নামেও পরিচিত।

বাড়িতে পৌঁছে নীরু আর নীমা শিশুটির নামকরণের আয়োজন করল। প্রচলিত রীতি অনুসারে জনৈক কাজীকে ডেকে আনল। পবিত্র কোরান খুলে প্রথম যে নামটি পাওয়া যাবে সেটিই হবে শিশুর নাম, এই হল রীতি। কাজী কোরান

খুললেন, যে পাতাটি বেরল তাতে নাম পেলেন 'কবীর' 'কুব্রা' 'আকবর' ইত্যাদি। এই শব্দের প্রত্যেকটিই 'পরমাত্মা'কে বোঝায়। কাজী মহা সমস্যায় পড়লেন—এক নগণ্য জোলার ছেলের নাম 'পরমাত্মা' হবে! এ-যে কানা ছেলের নাম পদ্মলোচনেরই মতো অবস্থা! কৌতূহলবশে কাজী আবার খুললেন কোরানশরীফ; আবার ঠিক ওই পাতাটিই বেরল। তারপর আরও একবার খোলা হল; কিন্তু প্রতিবারেই নাম পাওয়া গেল, 'কবীর' 'কুব্রা' 'আকবর'। এই খবর শুনে আরও ক'জন কাজী এলেন জোলার বাড়িতে। তাঁরাও আবার কোরান খুললেন— কিন্তু ওই একই নাম পেলেন। কাজীরা সবাই হতবুদ্ধি হয়ে শেষে নীরুকে পরামর্শ দিলেন, "ওই অলক্ষুণে শিশুটাকে বধ করো, নইলে তোমার অমঙ্গল হবে।" শোনা যায় কাজীর আদেশে নীরু শিশুকে বধ করার জন্য তলোয়ারও তুলেছিল, কিন্তু সে আঘাত শিশুর গায়ে লাগেনি। এই কথাটা অনেকেরই বিশ্বাস হবে না; কিন্তু এটা হয়ত বিশ্বাসযোগ্য এবং স্বাভাবিক যে নীরু ও নীমা দুজনেই শিশুটিকে এত ভালোবেসেছিল যে কাজী বা মৌলবীর পরামর্শ তারা নেয়নি। কুড়িয়ে পাওয়া অসহায় শিশুকে হত্যা করা দূরে থাক, এই ঘটনার পর নীরু-নীমার সন্তানবাৎসল্য শতগুণ বেড়ে গেল। তারা সর্বশক্তি দিয়ে শিশুটিকে আঁকড়ে রইল। শিশুর নাম 'কবীর'ই রাখা হল শেষ পর্যন্ত। এই কবীরের আসল মা-বাপ যে কারা ছিল, সে-কথা আজও কেউ জানতে পায়নি। এই অজ্ঞাতকুলশীল শিশুই একদিন ভারতের এক প্রখ্যাত সন্ত রূপে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করলেন। তাঁর নিজের জীবনের আদর্শে শুধু এদেশের নয়,

সারা দুনিয়ার মানুষের মনে সঞ্চার করলেন সত্য, ত্যাগ, নির্লিপ্ততা ও নির্ভীকতার অপূর্ব প্রেরণা।

কবীরের জন্মের সঠিক সন তারিখ পাওয়া কঠিন। তবে তাঁর জন্মতিথি প্রসঙ্গে একটি শ্লোক বেশ কিছুকাল ধরে প্রচলিত আছে। কিন্তু যেমন জানা যায় না কবীরের জন্মদাতার নাম, তেমনই পাওয়া যায় না এই শ্লোক রচয়িতার কোনো ঠিকানা। শ্লোকটি যে ঠিক কোন্ সময়ে লোকচক্ষুর গোচরে এসেছে সে-কথাও কেউ বলতে পারে না। শ্লোকটি এখানে দেওয়া হল—

চৌদহ সৌ পচপন সাল গএ,
চন্দ্রবার ইক ঠাঠ ঠএ।
জেঠ সুদী বরসায়ত কো,
পূরন মাসী প্রগট ভএ॥

অর্থাৎ বিক্রম ১৪৫৫ সংবৎ শেষ হলে পর জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমা তিথি সোমবার বটসাবিত্রীব্রতের দিনেই কবীরের অবির্ভাব। উক্ত বটসাবিত্রীর দিনটি আজও কবীরপন্থীরা কবীরের জন্মদিনরূপে উদ্‌যাপন করে থাকেন। আবার কারও কারও গণনায় ১৪৫৫ সংবতের জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা সোমবার ছিল না বলা হয়েছে। আসলে নাকি ওই পূর্ণিমা হবে ১৪৫৬ সংবতের। উপরে উদ্ধৃত শ্লোকের প্রথম পঙ্‌ক্তিটির অর্থ করলে এই দাঁড়ায় যে ১৪৫৫ সংবৎ গত হলে অর্থাৎ ১৪৫৬ সংবতেই কবীরের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু এ রকম গণনা যাঁরা করেছেন তাঁরাও প্রমাদমুক্ত নন। প্রকৃতপক্ষে ১৪৫৫ সংবতের জ্যৈষ্ঠপূর্ণিমা সোমবারই ছিল। কবীরের জীবনের কোনো-না কোনো

ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে কেউ কেউ মনে করেন যে তাঁর জন্ম আরও পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগেই হয়েছিল। এঁদের অনুমানই হয়ত ঠিক, হয়ত বা ঠিক নয়। সে কথা যাক।

'লহরতারা'র ঘটনাটি নিয়েও আবার অনেক গল্প রচিত হয়েছে। একটি গল্প এ রকম— একদিন এক ব্রাহ্মণ তাঁর বিধবা কন্যাসহ স্বামী রামানন্দকে দর্শন করতে যান। পিতা স্বামীজীকে প্রণাম করলে পর মেয়েটিও তাঁকে প্রণাম করল। স্বামীজী কৃপাবশে চোখ বুজে বিধবা কন্যাকে আশীর্বাদ করে বললেন, "পুত্রবতী হও।" কন্যার পিতা তো স্বামীজীর বর শুনে অবাক! বিধবার পুত্র হবে কেমন করে! কিন্তু সিদ্ধ-পুরুষের আশীর্বাদ তো ব্যর্থ হতে পারে না। কাজেই যথা-সময়ে বিধবার একটি পুত্রলাভ হল। বিধবা লোকলজ্জার ভয়ে অতি সঙ্গোপনে সেই নবজাত শিশুকে 'লহরতারা'র পুকুরে ফেলে দিয়ে এল। এই গল্পটির সঙ্গে কেউ কেউ আবার আরও কিছু বিস্ময়কর ঘটনা জুড়ে দিয়েছেন। তাঁরা বলেন যে যখন স্বামী রামানন্দ জানতে পারলেন যে ব্রাহ্মণ কন্যাটি বিধবা তখন তিনি তাকে অভয় দিয়ে বলেন, "মা আমার বাক্য তো ব্যর্থ হতে পারে না। বিধবা হলেও তুমি পুত্র লাভ করবেই তবে, তাতে তোমার কোনো কলঙ্ক হবে না। কারণ, তোমার এই অবাঞ্ছিত সন্তান কালক্রমে এক সন্তপুরুষে পরিণত হবেন।" লোকে বলে যে অতঃপর বিধবাটির হাতে একটি বিস্ফোটক দেখা দেয় এবং যথাসময়ে ওটি ফেটে যায় আর তার ভিতর থেকে একটি গোল নিটোল প্রাণী বেরিয়ে আসে। প্রাণীটি মাটিতে পড়েই একটি মানবশিশুর আকার ধারণ করে। এই কাহিনীকে আশ্রয় করে কবীরের আসল

নাম দাঁড়ায় 'কর-বীর' অর্থাৎ 'হস্ত-জাত বীর'। কবীর যে কারও গর্ভে ছিলেন না এবং তিনি যে প্রকৃতপক্ষে অযোনিসম্ভূত সে-কথা বোঝানোর জন্যই হয়ত এই কাহিনীর উৎপত্তি।

দ্বিতীয় গল্পটি আরও মনোরম। একবার বৈকুণ্ঠে ভগবান বিষ্ণু লক্ষ্মীর সঙ্গে বসে কথাবার্তা বলছিলেন, হঠাৎ কেন যেন উঠে তিনি বাইরে চলে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে আবার ফিরে এসে লক্ষ্মীর পাশে বসলেন। এই ঘটনায় লক্ষ্মীদেবী একটু রাগ করলেন এবং পতিদেবতাকে হঠাৎ উঠে-যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে ভগবান বললেন যে তাঁর এক ভক্ত বড় বিপদে পড়েছিল; তাকে রক্ষা করার জন্যই তিনি হঠাৎ উঠে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। লক্ষ্মীদেবীর বিস্ময়ের সঞ্চার হল। তিনি তো জানেন তিনি নিজেই বিষ্ণুর সব সেরা ভক্ত। তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ভক্ত আর কে আছে! ভগবান লক্ষ্মীর মনের কথা বুঝতে পেরে বললেন "সত্যিই, তোমার চেয়ে বড় ভক্ত আমার আছেন এবং তাঁর জন্য আমি সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারি।" পতিদেবতার এ-রকম উক্তিতে লক্ষ্মীদেবী যে আরও কোপাবিষ্ট হলেন সে-কথা বলাই বাহুল্য। তিনি তৎক্ষণাৎ বিষ্ণুকে বললেন যে সেই সেরা ভক্তের পরীক্ষা নিতে হবে। বিষ্ণু আর এক সমস্যায় পড়লেন, তিনি পত্নীকে এই ব্যাপারে নিরস্ত হতে বললেন, কিন্তু লক্ষ্মীদেবী তা শুনলেন না। এক মালিনীর বেশ ধারণ করে মায়াবলে লক্ষ্মী এলেন কাশীধামে। যে-পথ দিয়ে বিষ্ণুর সেই সেরা ভক্ত অর্থাৎ রামানন্দজী নিত্য গঙ্গাস্নানে যান, তারই পাশে এক স্থানে এক সবুজ শ্যামল বাগিচা সাজিয়ে রাখলেন লক্ষ্মীদেবী, রামানন্দ স্নানান্তে ভগবানের পূজার জন্য উক্ত মায়া-বাগিচায়

ঢুকে যেমনি ছু-চারটি ফুল তুললেন, অমনি মালিনীরূপী লক্ষ্মীদেবী তেড়ে মেড়ে এসে তাঁকে বললেন, "মহারাজ, আপনিও ফুল চুরি করলেন ?" রামানন্দজী তাড়াতাড়ি তাঁর তোলা ফুলগুলি মালিনীর আঁচলে ঢেলে দিয়ে নিজের পথে পা বাড়ালেন। কিছুক্ষণ পরে আবার যখন ওই পথ দিয়ে এলেন তখন বিস্ময়ভরে দেখলেন যে আগের জায়গায় না আছে কোনো বাগান, না আছে সেই মালিনী। ওদিকে দেবী লক্ষ্মী তো সেরা ভক্তের চুরি ধরতে পেরে মহা খুশি। বৈকুণ্ঠে ফিরে গেলে পর স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে বিষ্ণু যখন দেবীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভক্তের পরীক্ষা নেওয়া হল ?" দেবী তখন ভক্তের চুরি করা সেই ফুলগুলি দেখাবার জন্য আঁচলটি খুলে ধরলেন। কিন্তু এ কি ! ফুলের বদলে এ যে এক ফুটফুটে শিশু খেলা করছে ! লক্ষ্মীদেবী বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বললেন, "আমার সেই ফুলগুলি কোথায় গেল ?" এবার সুযোগ বুঝে পরিহাস করে ভগবান বিষ্ণু বললেন, "ভক্তকে পরীক্ষার ছলে এ তুমি কি নিয়ে এলে ?" পতিদেবতার কথা শুনে লক্ষ্মীদেবীর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। তিনি যে ভক্তের কাছে পরাজিত হয়েছেন সে-কথা স্বীকার করলেন এবং স্বকৃত অপরাধের মার্জনা চাইলেন। ভগবান এবার তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "যা হবার তা হয়েছে, এখন এই শিশুকে যেখান থেকে নিয়ে এসেছ সেখানে রেখে এসো। কালে এই শিশুই আমার আর এক প্রসিদ্ধ ভক্ত হবে।" আর কি করা যায় ! লক্ষ্মী আবার মর্ত্যলোকে নামলেন। 'লহরতারা'র পুকুরে এক পদ্মপাতার ওপর শিশুটিকে রেখে আবার স্বস্থানে চলে গেলেন। এই শিশুই পরবর্তীকালের প্রখ্যাত সন্ত কবীর।

তৃতীয় গল্পে কবীরকে শুকদেবের অবতার বলা হয়েছে। লোকে বলে শিবের আদেশে শুকদেব ধরায় আসেন মানব-হিতার্থে। তিনি পূর্বজন্মে বারো বছর মাতৃগর্ভে থাকার দুঃখ পেয়েছিলেন সে-কথা মনে রেখে এ জন্মে গর্ভবাসের দুঃখ থেকে তিনি স্বেচ্ছামুক্তি লাভ করেছেন। তিনি একটি ঝিনুকের মধ্যে নিজেকে বন্ধ করে গঙ্গার স্রোতে ভাসছিলেন। ঝিনুকটি ভেসে ভেসে শেষে এসে পৌঁছয় 'লহরতারা'র পুকুরে। দৈবক্রমে পুকুরের পদ্মপাতায় ঝিনুকটি খুলে যায় এবং তা থেকে একটি ফুটফুটে ছেলে বেরিয়ে আসে। এই ছেলেটিই পরবর্তীকালের প্রসিদ্ধ কবীর।

উপরে বর্ণিত তিনটি গল্পই কবীরের তিরোধানের বেশ কিছু-কাল পরে রচিত হয়েছে বলে মনে হয়। গল্পগুলি অনেকটা পৌরাণিক ধরণের। কাহিনীগুলি অতিমাত্রায় কল্পনাশ্রয়ী। লক্ষ্মীদেবী ও শুকদেবের কথায় রচিত গল্প দুটি তো একেবারেই পুরাণধর্মী। প্রথম গল্পটি তবুও কিছু পরিমাণে তথ্যনির্ভর। অবশ্য, কবীরপন্থীরা এর কোনোটাই বিশ্বাস করেন না। তাঁদের মতে কবীর গর্ভসম্ভূত নন। ইনি সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার অংশ, সে কারণে জন্ম-মৃত্যুর অতীত। প্রয়োজনবশে আপন মায়ায় আপনি প্রকটিত হন। কবীরপন্থীদের মতে কবীরের ত্রয়োদশ অবতার পূর্ববর্তী তিনযুগে অবতীর্ণ হয়েছেন। চতুর্দশ অবতারে ইনি কলিযুগে ১৪৫৫ বিক্রম সংবতে জ্যৈষ্ঠপূর্ণিমার দিনে কাশীধামের নিকট লহরতারা পুকুরে আত্মপ্রকাশ করেছেন। ওই সময়ে বৈষ্ণব অষ্টানন্দ পুকুরধারে ছিলেন। ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে আবছা-অন্ধকারে যখন ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল এবং ফুলে ফুলে ভোম্‌রা গুন্‌গুন্‌ করছিল ঠিক তখন

বৈষ্ণব অষ্টানন্দ এক অনুপম জ্যোতি দর্শন করে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলেন। এই অভূতপূর্ব ঘটনার কথা অষ্টানন্দ তাঁর গুরু রামানন্দজীকে বললে পর স্বামীজী সেই অনুপম জ্যোতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, "যে দিব্য জ্যোতি তুমি দর্শন করলে— তার বিষয়ে শীঘ্রই অনেক কিছু জানতে পাবে। এই জ্যোতির আলোকে চারদিকে আনন্দের সাড়া পড়ে যাবে।" গুরু রামানন্দের উক্তি সত্য হয়েছিল। সেই দিব্য জ্যোতি পুকুরে নেমে এক শিশুর মূর্তি ধারণ করল এবং একটি পদ্মফুলের ওপর খেলা করতে লাগল। নীমা এই দৈবশিশুর দেখা পেয়েছিলেন বলে শোনা যায়।

কবীরপন্থীদের গ্রন্থ থেকে এ-কথাও জানা যায় যে নীরু আর নীমা পূর্বজন্মে একবার সুদর্শন নামে জনৈক হরিজনের পিতামাতা ছিলেন। কিন্তু সুদর্শন ছিলেন ভক্তিমান। এই কারণে তাঁর পিতামাতা পরের জন্মে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী হয়ে চন্দ্রবার শহরে বসবাস করতে লাগলেন। তখন ওই দম্পতির পরিচয় ছিল 'নরহরি' আর 'লছিমা' নামে। তাঁদের স্নেহের আকর্ষণে কবীর তাঁদের ঘরে এলেন। কিন্তু অজ্ঞানতাবশে তাঁরা এই অবতারকে চিনতে পারেননি। কাজেই কবীর অন্তর্হিত হলেন। সন্তানের বিচ্ছেদ সহ্য করতে না পেরে নরহরি-লছিমা দেহত্যাগ করেন। এঁরাই পরের জন্মে কাশীতে এলেন জোলা দম্পতি হয়ে। এঁদেরই পরিচয় নীরু আর নীমা রূপে। পরবর্তী গল্পও প্রায় একই প্রকারের; তবে তাতে কেবল এটুকু ব্যতিক্রম যে কবীরের নামকরণের সময় কাজী যখন নীরুকে শিশুহত্যার আদেশ দেন এবং নীরু যখন শিশুর দেহে ছুরি চালাতে যায় তখন শিশু কবীর একটি শ্লোক উচ্চারণ করেন।

শ্লোকটি হল এই—

সন্তো মৈঁ অবিগত সোঁ চলি আয়া।
মেরা মরম কনূহুঁ নহিঁ পায়া ॥
না মেরে জনম ন গরভ বসেরা, বালক হৈঁ দিখলায়া।
কাসীপুরী জংগল বিচ ডেরা তহাঁ জুলাহে পায়া ॥১॥
না মেরে ধরনি গগন পুনি, নাহীঁ ঐসা অগম অপারা
জ্যোতিস্বরূপ নিরঞ্জন দেবা সো হৈ নাঁব হমারা ॥২॥
হতা বিদেহ দেহ ধরি আয়া, কায়া কবীর কহায়া।
পিছলে জনম মেঁ কৌল কিয়া থা, তব তেরে ঘর আয়া ॥৩॥
না মেরে হাড় চাম নহিঁ, লোহু এঁকৈ নাঁব উপাসী।
তারণ তরণ অভয় পদ দাতা, কহৈ কবীর অবিনাসী ॥৪॥

এই শ্লোকে মহাত্মা কবীরের বিগত জীবনের যে বিবরণ আছে সে বিষয়ে আগেও বলা হয়েছে। কবীরপন্থীদের বিশ্বাস তারও আগে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে মহাত্মা কবীর পরপর 'সত্যসুকৃত' 'মণীন্দ্র' ও 'করুণাময়' এই তিনটি নামে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভক্তিবিশ্বাসের ক্ষেত্রে কোনোরূপ বিরূপ সমালোচনা করা ঠিক নয়। ভক্তি দ্বারা বহু বড় বড় ব্যাপার সংঘটিত হয়ে থাকে। কিন্তু এ-কথাও মনে রাখতে হবে যে ভক্তি যেন অন্ধভক্তিতে পরিণত না হয়। কারণ অন্ধতা আমাদের অধোগতি ডেকে আনে। আবার দেখা যায় যে এই গল্পগুলিতে এমন অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে যা অতি সহজ সরল মানুষও বিশ্বাস করতে পারবে না। কবীর সম্পর্কে উদ্‌ঘাটিত যে-সকল তথ্যের পুঁজি আমাদের আছে তার

সহায়তায় আমরা অন্তত এটুকু বলতে পারি যে কবীরের জন্মদাতার সম্বন্ধে কেউই কিছু জানেন না। শুধু তাই নয়, কবীরের জন্মস্থানও অজ্ঞাত। কোনো কোনো জীবন-কাহিনীতে 'লহরতারা' গ্রামের সঙ্গে কবীরের নাম জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তাতেই অধিকাংশের ধারণা এই যে কবীর 'লহরতারা'য় জন্ম-গ্রহণ করেছেন। কিন্তু কেউ কেউ আবার আজমগড় জেলার 'বেলহরা' গ্রামটিকে কবীরের জন্মস্থান বলে মনে করেন। তাঁরা এ কথাও বলেন যে 'বেলহরা' নামটিই কালক্রমে পরিবর্তিত হয়ে 'লহরতারা'য় দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এই দুই নামের দুই গ্রামের অনুসন্ধান করে দেখা গেল, না-পাওয়া যায় 'বেলহরা' গ্রামের ঠিক ঠিকানা, না-পাওয়া যায় 'বেলহরা'র 'লহরতারা'য় পরিণত হওয়ার কোনো লিখিত ইতিহাস। আজমগড় জেলা ছেড়ে বেলহরা কখন কেমন করে কাশীর পাশে এসে বসল— ভেবেও পাওয়া যায় না এ প্রশ্নের কোনো উত্তর। এই ভাবে কবীরের জন্মস্থান সম্বন্ধে আরও কিছু সংখ্যক লোক যে ধারণা পোষণ করেন সে হল এই যে কবীর মগহরে জন্ম নিয়ে ওখানেই দেহত্যাগ করেছেন। এই কথার সত্যতা প্রমাণ করতে গিয়ে তাঁরা উল্লেখ করেন এই পদটির—

'পহিলে দরসন মগহর পায়ো ফুনি কাশী বসে আঈ।'

প্রথম দর্শন হল মগহর গ্রাম
তারপরে বসতি করিনু কাশীধাম॥

কিন্তু একটি জটিল সমস্যার বিষয় এই যে বহু পদ আর দোহা অন্য লোকেরা রচনা করে পরে কবীরের নামে চালিয়ে দিয়েছেন। এ-রকম পদের উল্লেখ আগেও করেছি। আর

উপরে লিখিত পঙ্‌ক্তিটিও অনুরূপ পদেরই উদাহরণ। বস্তুতঃ নিশ্চিতভাবে কেবল এটুকুই বলা যায় যে কাশীনিবাসী জোলা-দম্পতি নীরু আর নীমা কবীরকে প্রতিপালন করেছিলেন।

কবীরের বাল্যকাল সম্বন্ধে এই ধরণের অনেক গল্প প্রচলিত আছে। শোনা যায়, পানাহার ছাড়াই তাঁর দেহ স্বাভাবিক ভাবে পুষ্ট হয়ে উঠছিল। তা দেখে নীরু ও নীমা বড়ই দুশ্চিন্তায় পড়লেন— তাঁরা ভাবতে লাগলেন কেন এই ছেলে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিল! তাঁদের দুঃখিত দেখে কবীর দুধ খেতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু এই দুধ এক অদ্ভুত ভাবে তিনি পেতেন। এমন একটি বাছুর দুধ দিত যার বাচ্চাই হয়নি। দুধ পাবার ইচ্ছা মনে রেখে কবীর যখনই বাছুরটির দিকে তাকাতেন তখনই কচি বাট থেকে দুধ ঝরতে থাকত। বাটের নীচে একটি নূতন বাসন দিয়ে রাখতেন। বাসনটি কানায় কানায় দুধে ভরে উঠত। কবীর প্রতিদিন সেই দুধ পান করতেন।

জোলার ঘরে মানুষ হয়েও কবীর ঈশ্বরকে রাম, গোবিন্দ ও হরি নামে স্মরণ করা পছন্দ করতেন। তখন দেশে যে সুলতানের রাজ্য ছিল, সে অতি গোঁড়া ছিল, এইজন্য ধার্মিক নির্যাতন হত। এই অবস্থায় হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের প্রতি প্রেমপ্রবণ না হয়ে ছিল বিদ্বেষ-পরায়ণ। এইজন্য এটা খুবই স্বাভাবিক যে মুসলমান-পরিবারে প্রতিপালিত কোনো বালক যদি মুখে 'রামনাম' উচ্চারণ করে, তাহলে তার আত্মীয়স্বজনরা রাগ করবেনই। মুসলমানেরা কবীরের কাণ্ড দেখে তেলে বেগুনে জ্বলত আর বলত, 'এই ছেলে 'কাফের' (নাস্তিক) হবে।'

কবীর এ-কথা শুনে চুপ করে থাকতেন না। উত্তরে বলতেন, 'কাফের তাকেই বলে—যে লুঠেরা হয়ে পরের ধনসম্পদ লুঠ করে, যে ঠগী হয়ে দুনিয়ার লোককে ঠকায়, এবং যে নৃশংস হয়ে অসহায় জীবজন্তু হত্যা করে।' তিনি মুসলমান ঘরে জন্মেছিলেন বলে সর্বপ্রথম মুসলমানদেরই বকুনি দিলেন।

কবীর কাজীকে বলছেন, "তুমি কোরানের বাহ্যিক ভড়ং ছেড়ে দিয়ে রামের ভজনা করো, তা না হলে তুমি বড়ই অন্যায় করবে। আমি তো রামেরই স্মরণ নিয়েছি; তবু মুসলমানেরা আমাকে ছাড়ে না, কেবল তাদের দলে টানতে চায়; কিন্তু আমার কাছে হার মেনে পালায়।"

ছাঁড়ি কতেব রাঁম ভজু বৌরে, জুলুন করত হৈ ভারী।
কবীরৈ পকড়ী টেক রাঁম কী, তুরূক রহে পচিহারী॥

কবীর যেভাবে কোরানের নিন্দা করেন, সেভাবে বেদ-পুরাণেরও নিন্দা করেন। তাঁর রাম হিন্দুদের রাম থেকে আলাদা ছিল। তবুও রাম শব্দ ছিল তাঁর প্রিয়।

বাল্যকাল থেকেই রামের প্রতি ভক্তি কবীরের একটা নেশার মতো ছিল। এই নেশায় তিনি এক-একবার এমন মত্ত হতেন যে তাঁর নিজের কাজ সুতো কাটা ও কাপড় বোনা পর্যন্ত ভুলে যেতেন। তাঁর এই উদাসীনতা লক্ষ্য করে তাঁর মা নীমা ঈশ্বরকে ডেকে বলতেন, হে খোদা, এই ছেলে কি খেয়ে বাঁচবে! তখন কবীর তাঁর মাকে বুঝিয়ে বলতেন, কি করি বল মা, আমি যখন নলির মধ্যে সুতো পরাতে শুরু করি তখন আমার প্রাণপ্রিয় রাম আমাকে ভুলে যায়! তুমি

কোনো চিন্তা কোরো না। রাম ত্রিলোকপতি। যিনি তিন-লোকের সকল প্রয়োজন প্রতিদিন মিটিয়ে চলছেন, তিনি নিশ্চয়ই আমার প্রয়োজনীয় সামগ্রীর কথাও মনে রাখেন। তিনিই আমাদের অভাব অভিযোগ দূর করবেন।—

তননাং বুননাং তজ্যো কবরী।
রাঁম নাঁম লিখি লিয়ো সরীর॥
মুসি মুসি রোবৈ কবীর কী মাঈ।
যহ বারিক কৈসে জীবৈ খুদাঈ॥
জব লগ তাগা বাহৌ বেহী।
তব লগ বিসরৈ রাম সনেহী॥
কহত কবীর সুনহ মেরি ভাঈ।
পুরনহারা ত্রিভুবনারঈ॥

একে তো হিন্দু দেবতার নাম জপ করতেন বলে মুসলমানেরা তাঁর প্রতি বিরূপ ছিলেন, আবার অন্যদিকে হিন্দুরাও তাঁর ওপর খুশি ছিলেন না; কারণ যদিও প্রেম ভক্তি বিষয়ে তাঁর বিশ্বাস ছিল অবিচল তবুও তিনি কিছুতেই হিন্দুদের মূর্তিপূজা ও ছুৎমার্গ প্রভৃতি কুসংস্কারের কঠোর সমালোচনা করতেন। কবীর সাহেব সর্বদা হিন্দু বৈষ্ণব ভক্তের মতো থাকতেন। ব্রাহ্মণেরা এজন্য রেগেই থাকতেন; তাঁদের বক্তব্য এই যে মুসলমানের ঘরে থেকে হিন্দু বৈষ্ণবের মতো আচরণ করা— এটা কবীরের একটা অনধিকারচর্চা। তাঁরা তাই কবীর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করতেন যে কোন্ বৈষ্ণব গুরু তাঁকে দীক্ষা দিয়েছেন! তাঁদের ধারণা ছিল যে গুরুকরণ না

করলে কোনো বৈষ্ণবেরই মুক্তি লাভ হয় না। এ-সমস্ত কথা শুনে কবীরের মনে বড়ই লাগল। শোনা যায় যে তখন কাশীতে সবচেয়ে বিখ্যাত বৈষ্ণবগুরু স্বামী রামানন্দ ছিলেন। কবীরের বাসনা হল যে তাঁরই কাছে তিনি দীক্ষা নেবেন। কিন্তু দ্বিধা জাগল তাঁর মনে এই কথা ভেবে যে একজন বৈষ্ণবগুরু কি এক তাঁতীকে দীক্ষা দেবেন! বাধাবিঘ্ন দূর করার এক কৌশল খুঁজে বের করলেন কবীর। স্বামী রামানন্দ প্রতিদিন প্রত্যূষে অন্ধকার থাকতেই শিষ্যদের নিয়ে গঙ্গাস্নানে যেতেন। কবীর ঠিক সময় বুঝে স্বামীজীর চলার পথের ধারে চুপচাপ বসে রইলেন। তারপর স্বামীজী যখন 'রাম রাম' বলতে বলতে চলে গেলেন, কবীর তাঁর দর্শন পেলেন এবং তাঁর মুখে উচ্চারিত 'রাম' নামকে গুরুর দেওয়া মন্ত্র জ্ঞান করে ঘরে ফিরে এলেন। এবার গলায় কণ্ঠি ধারণ করে সবাইকে বললেন যে গুরু রামানন্দ তাঁকে দীক্ষা দিয়েছেন। কেউ কেউ বলেন যে অন্ধকারে রামানন্দ যখন পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর পায়ের খড়ম কবীরের শরীরে ঠেকে, তাতে স্বামীজী চমকে উঠেই 'রাম রাম' বলেন—আর কবীর এই নামকেই তাঁর গুরুমন্ত্র রূপে স্বীকার করে নেন।

এই কথা জানতে পেরে নীরু ও নীমা বড়ই বিচলিত হয়ে পড়লেন—মুসলমান জোলার ঘরের রীতি-আচার সমস্ত বাদ দিয়ে তাঁদের ছেলে কবীর কিনা কপালে তিলক কাটে আর গলায় মালা পরে 'রাম' 'রাম' বলে! হিন্দু সমাজেও হৈ চৈ লেগে গেল—স্বামী রামানন্দ এ কি সর্বনাশ করলেন, এক মুসলমানকে দীক্ষা দিয়ে দিলেন? এই খবর রামানন্দের কানেও গিয়ে পৌছল। তিনি তো বিস্ময়ে হতবাক্! তিনি তো জ্ঞাতসারে

এমন কিছু করেছেন বলে মনে পড়ে না! কথাটার সত্যতা নির্ণয়ের জন্য তিনি কবীরকে ডেকে পাঠালেন। কবীর যখন আচার্য রামানন্দের কাছে উপস্থিত হলেন—রামানন্দ তখন মানসধ্যানে মগ্ন; বাইরে থেকে তাঁকে দেখা যায় না, চারদিকে পর্দা ঘেরা। যে পূজায় তিনি বসেছিলেন তার সব উপকরণই ছিল—তবু স্বামীজী পূজা শেষ করতে পারছিলেন না—তাঁর মনে হচ্ছিল কি যেন একটা কম পড়ে গেল, এবং তাতে পূজার্চনার বাধা ঘটছিল। কবীরদাস বাইরে থেকে বলে উঠলেন, "স্বামীজী, আত্মদেবতাকে তো আপনি তুলসীপত্র নিবেদন করেননি!" এ কথা শুনে রামানন্দ বিস্মিত হলেন। তিনি কবীরকে বললেন, "আচ্ছা কবীর, তোমাকে আমি কখন দীক্ষা দিলাম যে তুমি নিজেকে আমার শিষ্য বলে প্রচার করছ?" কবীর যা যা ঘটেছিল সমস্ত খুলে বললেন গুরু রামানন্দকে—কেমন করে তিনি বসেছিলেন পথের পাশে এবং কেমন করে স্বামীজী গঙ্গাস্নানে যাবার সময় 'রাম রাম' বলতে বলতে পথ চলছিলেন—বর্ণনা দিয়ে সেদিনকার সকল কথা জানালেন স্বামীজীকে। স্বামীজী কবীরের কথা শুনে বললেন "আচ্ছা, এমন করে কি কোনো গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ গড়ে উঠতে পারে?" কবীর এবার বিনয় সহকারে বললেন, "মহারাজ, বেদে তো 'রাম' নামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ অন্য কিছুর কথা বলা হয়নি?" স্বামীজীও বললেন, "ঠিকই বলেছ, শাস্ত্রে ভগবানের নামকেই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে।" কবীর এবার বললেন, "তাহলে স্বামীজী, তাই যদি হয়, আপনার কাছে মন্ত্র নিতে গেলে আপনি ঐ সময় ভগবানের নামের চেয়ে বড় অন্য কোনো মন্ত্র দিতে পারেন কি—অথবা অন্য কোনো

রহস্য আছে ?” কবীরের মুখে এ-রকম উত্তর পেয়ে স্বামীজী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। তিনি তাঁর চারিদিকের ঘেরা পর্দা খুলে নিয়ে কবীরদাসকে দর্শন দিলেন এবং তাঁকে নিজের শিষ্যরূপে স্বীকার করলেন।

এমন আরও কারণ ঘটেছে সময় সময়, যখন রামনন্দজী কবীরের বুদ্ধির কাছে হার মেনেছেন। এমন সব ঘটনা নিয়ে সুন্দর সুন্দর গল্পও প্রচলিত আছে। একটি সুন্দর গল্প এখানে বলছি।

একবার স্বামী রামানন্দের পিতৃশ্রাদ্ধের জন্য গোরুর দুধ দরকার হয়। কবীরকে দুধ সংগ্রহের ভার দেওয়া হয়। কবীর দুধের জন্য একটি বাসন হাতে নিয়ে বেরুলেন। অনেক খুঁজে পেতে তিনি একটি মৃতগাভীর কাছে আসেন। দুধের বাসনটি যথাস্থানে রেখে গাভীর মুখের কাছে ঘাস তুলে খেতে দিলেন ; তাঁর ধারণা গাভী একদিকে ঘাস খাবে আর অন্যদিকে দুধ ঝরবে। কিন্তু মৃতগাভী ঘাসও খেল না, দুধও দিল না। এদিকে তো দিন চলে গেল, কবীরদাস দুধ নিয়ে গুরুগৃহে ফিরলেন না। বিলম্ব দেখে রামানন্দজী আর একজন শিষ্যকে পাঠালেন কবীরের খোঁজে। শিষ্য খুঁজে পেলেন কবীরকে এবং ফিরে গিয়ে কবীরের কীর্তিকাণ্ডের কথা বললেন গুরু রামানন্দকে। গুরুর কাছে ফিরে যেতেই তিনি কবীরকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমাকে পাঠালাম দুধ আনতে আর তুমি গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলে একটা মরা গোরুর কাছে—এর কারণ কি ?” কবীর উত্তরে বললেন, “আমি ভেবেছি যে মৃত পিতার জন্য মৃত গাভীর দুধই উপযোগী হবে কিন্তু দুধ দেওয়া তো দূরের কথা, গাভীটা ঘাসই খেলো না !” স্বামীজীর শিষ্যের

এই আজগুবি কথা শুনে বললেন, "মরা গোরু কখনও ঘাস খেতে পারে?" কবীর সাহেব সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলেন, "সদ্যমৃত গোরু যদি ঘাস খেতে না পারে তো বহু বর্ষ পূর্বে যার মৃত্যু হয়েছে তিনিই বা দুধ পান করবেন কেমন করে? আপনিই বা কেন তাঁর উদ্দেশে দুধ নিবেদন করছেন?" স্বামী রামানন্দ এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেলেন না।

এই গল্পের মূলে সত্য আছে একথা প্রমাণিত না হলেও সাধারণের কাছে কবীরসাহেবের ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর তর্কনৈপুণ্য ছিল অসাধারণ, ব্যঙ্গ করতে গিয়ে যে তীক্ষ্ণ ভাষা তিনি ব্যবহার করতেন, সাধনা ছাড়া সে ভাষা আয়ত্ত করা কঠিন। তাঁর বাণীতে সর্বত্র তাঁর ভাষা প্রয়োগের কুশলতার ছড়াছড়ি লক্ষ্য করা যায়। হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের বাহ্যিক ভ্রান্তিজাল ছিন্ন করার জন্য তিনি এই তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গময় ভাষায় কথা বলতেন। উপরে লিখিত কাহিনীটি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আর একটি গল্প বলি,—

শোনা যায়, একদা দুই ব্রাহ্মণের মধ্যে শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। একজন বললেন, ভগবান এক; অন্যজন বললেন, দুই। পরস্পর এ নিয়ে তর্কাতর্কি করতে করতে শেষে মীমাংসার জন্য দুজনেই এসে হাজির হলেন কবীর সাহেবের কাছে। তিনি দুজনের কথা মন দিয়ে শুনলেন তারপর তাদের জিজ্ঞেস করলেন, "পরমাত্মার রঙ কি বলো তো? হলুদ, সবুজ, কালো অথবা অন্য কোন্ রঙের তিনি? দুজন পণ্ডিতই উত্তর দিলেন যে তাঁর কোনোই রঙ নেই। কবীর আবার জিজ্ঞেস করলেন, "তিনি গৌর অথবা কৃষ্ণ? তিনি কি পর্বতের মতো বড় অথবা পিপীলিকার মতো ক্ষুদ্রকায়?"

পণ্ডিতগণ এই প্রশ্নের উত্তরেও 'না' বললেন। এবার কবীর বললেন, "আচ্ছা ভাই, যদি পরমাত্মার কোনো রূপ নেই, রঙ নেই, কোনো আকার-প্রকারও নেই, তাহলে তাঁর সংখ্যাই বা নিরূপণ করবে কে? তিনি এক নন, দুইও নন, কিন্তু একই সঙ্গে বহুর মধ্যে বিরাজও করছেন।"

এই কাহিনীও হয়তো বা পরে রচিত হয়েছে; তবুও কবীর সাহেবের স্বরূপটি এতে কিন্তু ঠিক ঠিক আঁকা হয়েছে। তাঁর রচিত পদের মধ্যেও ভক্তের মহিমা বর্ণনায় তাঁর সাদাসিধে অথচ চমৎকার কুশলতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন তিনি বলেছেন,

ঝগরা এক নিবেরহু রাঁম।
জে তুম্হ অপনে জন সৌ কাঁম॥
ব্রহ্মা বড়া কি জিন রে উপায়া।
বেদ বড়া কি জহাঁ তে আয়া॥
যহু মন বড়া কি জেহি মন মাঁনৈ।
রাম বড়া কি রাঁমহিঁ জাঁনৈ॥
কহৈ কবীর হোঁ ভয়া উদাস।
তীরথ বড়া কি হরি কা দাস॥

কত সরলভাবে তিনি কত কঠিন ভাবের কথা জানিয়েছেন!

কবীরপন্থী ছাড়া অন্যেরাও স্বামী রামানন্দকেই কবীরের গুরু বলে স্বীকার করে থাকেন। কিন্তু যখন আমরা এই দুজন একই সময়ে ছিলেন এবং অমুক সময়ে তাঁদের পরস্পরের সাক্ষাৎকার ঘটেছিল ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করি তখন কিছুটা সমস্যাও দেখা দেয়। কারণ, রামানন্দজী লোকান্তরিত

হন ১৪৬৭ বিক্রম সংবতে, আর কবীরের জন্ম হয় ১৪৫৫ তে। সেই অনুসারে স্বামীজীর দেহান্তকালে কবীর সাহেবের বয়স এগারো-বারো বছরের বেশি নয়। এরও দু-চার বছর আগে কবীর দীক্ষা পেয়েছেন এমন যদি হয় তাহলে মানতে হবে যে তখন তাঁর বয়স আরও দু-চার বছর কম ছিল। কিন্তু এত অল্প বয়সে তাঁর দীক্ষা গ্রহণের কথায় বিশ্বাস সহজে জন্মে না। এ জন্য কবীরের জন্ম তারিখ আরও পিছনে নিয়ে যেতে চান অনেকে ; কিন্তু এই প্রচেষ্টা কতদূর ফলপ্রসূ হবে সে-কথা বলা কঠিন।

দেখা যাচ্ছে যে কবীর সাহেবের জন্মগ্রহণ ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করে যে-সকল গল্প তৈরি হয়েছে তার সঙ্গে স্বামী রামানন্দের নামও জড়িত, কিন্তু এই মহাত্মার নাম এমনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যে তা থেকে বোঝা যায় যেন রামানন্দজীর মাহাত্ম্য ঘোষণার জন্যই এই প্রচেষ্টা। স্বামী রামানন্দ তাঁর সময়ে সবচেয়ে বড় মহাপুরুষ ছিলেন এ-কথা সত্য, কিন্তু এ থেকেই প্রমাণিত হয় না যে তিনিই কবীরকে দীক্ষা দান করেছিলেন। কারণ, কবীরের যে বাণীগুলিকে তাঁর মূল রচনা বলে স্বীকার করা যায় তাতে তাঁর সময়ে জীবিত ছিলেন এমন কোনো ব্যক্তির নাম জানা যায় না। কেবলমাত্র তাঁর একটি পদে মতিসুন্দর নামে এক মহাত্মার উল্লেখ দেখা যায়। এই পদের প্রথম কলিটি হল—

মেরী মতি বঊরী মৈঁ রাঁম বিসারয়োঁ,
কেহি বিধি রহনি রহোঁ রে।
সেজৈ রমত নৈঁন নহিঁ পেথৌঁ,
যহ দুখ কাসোঁ কহোঁ রে।

এবং শেষ কলিটি হল—

সোচি বিচারি দেখৌ মন মাঁহীঁ, ঊসর আই বন্যৌঁ রে।
কহৈ কবীর সুনহু মতিসুন্দর, রানা রাঁম রমৌঁ রে॥

এখানে 'মতিসুন্দর' বলতে 'সুবুদ্ধি'সম্পন্ন মানুষও বোঝায়। আবার কোনো মানুষের নাম হিসেবেও ধরা যায়। 'মতি-সুন্দর' নামে জনৈক সাধুর কিছু সংখ্যক পদও পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে কবীর তাঁর রচনায় ঠিক এই মতিসুন্দরের কথাই বলেছেন বা অন্য কারও নাম উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া কবীর ও মতিসুন্দরের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ যে কি ছিল, সে কথা কোথাও স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি।

মহাত্মা কবীরের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে প্রতিষ্ঠিত সন্ত হয়েও তিনি গৃহস্থই ছিলেন এবং গৃহস্থ হয়েও যে-কোনো মানুষই যে ভক্তিধর্ম আশ্রয় করতে পারে— কবীর সম্বন্ধে লেখা সকল পুরানো জীবনীতেই সে-কথা জানা যায়। কবীরের কোনো কোনো পদেও তার উল্লেখ আছে।

অনন্তদাস নামে এক অতি বৃদ্ধ সন্ত **"কবীর সাহব কী পরচঈ"** নাম দিয়ে আনুমানিক ১৬৪৫ সংবতে এক জীবনী লিখেছিলেন। তাতে তিনি বলেছেন যে কবীর সাহেব কাপড় বুনতেন, কাপড় বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রী করতেন। কেবল কাপড় বিক্রী থেকে যে উপার্জন হত, তা দিয়েই তিনি নিজের এবং পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করতেন। তাঁর ভক্তদেরও কেউ কেউ তাঁর এই সামান্য উপার্জনে প্রতিপালিত হতেন। শুধু কি তাই, কোনো প্রার্থীকেই তিনি বিমুখ করতেন না।

একদিন এক গরিব ব্রাহ্মণ কবীরের কাছে এসে হাজির

হলেন। কবীর তখন বাজারে বসে কাপড় বিক্রী করছিলেন। তখনও বিক্রী শুরু করেন নি— এমন সময় সেই ব্রাহ্মণ এসে তাঁর লজ্জা নিবারণের জন্য কাপড় ভিক্ষা চাইলেন। কবীরের কাছে এক থান কাপড়ই ছিল; তিনি তার অর্ধেক ব্রাহ্মণকে দিতে চাইলেন; কিন্তু ব্রাহ্মণ পুরো থানটিই চেয়ে বসলেন। কবীর তাঁকে সমস্ত থানটিই দিয়ে দিলেন, সেদিন তাঁর কাছে আর কাপড় ছিল না, কাজেই একটিও পয়সা হল না হাতে। শূন্য হাতে বাড়ি ফিরবেন কেমন করে এ-কথা ভেবে ভেবে তাঁর বড় লজ্জা হল মনে। তিনি বাড়ি গেলেন না। বাজারে আশেপাশে কোনো-এক জায়গায় লুকিয়ে বসে রইলেন। তাঁর বাড়ির লোকেরাও তাঁর কোনো খবর পেলনা। এভাবে তিন দিন অতীত হল। তাঁর পরিবারবর্গ ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে উঠল। এমন সময় এক বিস্ময়কর কাণ্ড ঘটল। চেনা নয় জানা নয় একটা লোক এক গোরুর গাড়ী বোঝাই করে সকল রকম খাদ্যসামগ্রী নিয়ে এসে হাজির হল এবং কবীর সাহেবের ঘরে সব ঢেলে দিয়ে গেল।

মা নীমা তো এ-সমস্ত ব্যাপার দেখে অবাক। কারণ তাঁর ছেলে কবীর যে এত জিনিস পাঠাতে পারবে না সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। ছেলের স্বভাব তিনি জানেন, কেউ লক্ষ টাকা দিলেও ছেলে তা হাতে নেবে না, কারণ কবীর বিনা পরিশ্রমে কারও কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করে না। কিন্তু এ-সমস্ত খাদ্যসামগ্রী কার কাছ থেকে এল, সেটাও তো জানা দরকার। নীমা তাই ঐ লোকটিকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন, বিশ্বনাথ-দর্শনে এক রাজা এসেছিলেন, তিনি তোমার ছেলের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে এ-সমস্ত খাদ্যসামগ্রী

দিয়েছেন; তোমার ছেলেকে অনেক অনুনয় বিনয় করে বলাতে তবে তিনি এগুলো নিতে রাজি হয়েছেন—তবে তো রাজা এগুলো পাঠালেন। তোমার ছেলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে।" এই কথাগুলি বলেই লোকটি চলে গেল এবং নীমাও লোকটির কথাতেই বিশ্বাস করলেন। কয়েকজন আবার এর মধ্যেই ছুটে গিয়ে কবীরকে এ-সমস্ত ঘটনার কথা জানাল। কবীর এবার ঘরে ফিরলেন এবং মা নীমার কাছে সকল বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শুনলেন। মনে মনে কবীর ভাবলেন—এ-সমস্ত কাণ্ড একমাত্র সর্বশক্তিমান ভগবানের দ্বারাই সম্ভব। এই ঘটনায় তাঁর মনে ভগবদ্-বিশ্বাস আরও দৃঢ় হল। তিনি টানা-বোনার কাজ একেবারে ছেড়ে দিলেন। হরি ভজনাই এখন হল তাঁর সারা দিনরাত্রির একমাত্র কাজ। হরিভক্তিতে তিনি একেবারে মেতে উঠলেন। তাঁর অনুগত ভক্তদের নিয়ে তিনি এক মহোৎসবের আয়োজন করলেন; ঘরে যা-কিছু খাদ্যসামগ্রী অবশিষ্ট ছিল সমস্ত দিয়ে মহোৎসবে আগত অতিথিদের সৎকার করে তিনি সম্পূর্ণ রিক্ত হলেন।

কবীরের কীর্তিকলাপ লক্ষ্য করে কাশীর সকল ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীরা ঈর্ষার আগুনে পুড়ে মরতে লাগল। তারা সকলে মিলে কবীরকে অপমানিত করার কৌশল খুঁজতে লাগল। তারা ভেবেচিন্তে ঠিক করল যে কবীরের নাক কেটে তাকে শহর থেকে বের করে দিতে হবে। মজা দেখার জন্য কাশীর মানুষেরা যেন উড়ে এসে ভিড় করল। সকলে গিয়ে কবীরের বাড়ি ঘেরাও করে ফেলল। কবীর সকলকে সমাদর করে বসালেন এবং জানতে চাইলেন কেন তাঁরা কৃপা করে কবীরের ঘরে পায়ের ধূলি দিলেন। ব্রাহ্মণেরা ক্রুদ্ধকণ্ঠে গর্জন করে

বললেন, "তোমাকে আজ শহর ছেড়ে চলে যেতে হবে।" কবীর বললেন, "আমি এমন কী কাজ করেছি যার জন্য আপনারা এত ক্রুদ্ধ হয়েছেন? আমি তো কারও কিছু চুরি করিনি, কাউকে অসম্মানও দেখাইনি। রাম নাম জপ করি আর নিজের পথেই নিজে চলি।" ব্রাহ্মণেরা বললেন, "তুমি তো শূদ্রদের ডেকে খাইয়েছ, আমাদের জিজ্ঞাসা করাও প্রয়োজন বোধ করনি। যাহোক, হয় তুমি এখানে আমাদেরও ভোজনের ব্যবস্থা কর, অন্যথায় শহর ছেড়ে চলে যাও।"

কবীর বড়ই সমস্যায় পড়লেন। ঘরে তাঁর এককণা তণ্ডুল নেই, আবার ওদের খেতে না দেওয়াও অধর্ম। আপাততঃ খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহের নাম করে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ভগবানের এমনই ইচ্ছা যে ভক্তের অপমান তিনি ঘটতেই দেন না। কবীর সাহেব ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পরই দেখা গেল কেশব বনজারা নামে এক ব্যক্তি কয়েকটি মজুরের মাথায় বস্তা বস্তা ময়দা, চাল ও চিনি ইত্যাদি চাপিয়ে নিয়ে আসছে। ব্রাহ্মণদের কাছেই ঐ সমস্ত ভোজ্যসামগ্রী রাখা হল। ব্রাহ্মণগণ প্রত্যেকে আড়াই সের করে চাল, চিনি, ময়দা এবং এক বিড়া করে পান পেল। যথাযোগ্য 'সিধা' পেয়ে ব্রাহ্মণদের রাগ জল হয়ে গেল। তারা কবীরের নামে 'ধন্য ধন্য' করতে করতে যে যার ঘরে ফিরে গেল। পথে যেতে যেতে তারা পরস্পরে এ-কথাও বলাবলি করেছিল যে এবার কবীরের বিরুদ্ধে যদি কেউ কোনো কথা বলে তবে তার ভালো হবে না— সে নরকে যাবে।

ভগবানের মহিমা অপার। ঘর ছেড়ে কবীর যেখানে

লুকিয়ে বসে ছিলেন— ভগবান এক ব্রাহ্মণের বেশে সেখানে এসে বললেন, "তুমি কেন কবীরের ঘরে যাওনি? সেখানে তো মহোৎসব হচ্ছে। তুমি কি জান না যে ওখানে সকল ব্রাহ্মণদের আর সন্ন্যাসীদের সিধা দেওয়া হচ্ছে। এই দেখ না, আমিও তো ওখান থেকেই সিধা নিয়ে এলাম— এই-যে আমার পুঁটলি!"

এ-কথা শুনে কবীর সাহেবের প্রত্যয় হল যে ভগবান এই দ্বিতীয়বার তাঁর মান বাঁচালেন। তিনি ঘরে ফিরে এসে দেখলেন যে এখানে অন্নের হাট বসে গেছে। ব্রাহ্মণেরা সিধা বেঁধে নিয়ে আশীর্বাদ করতে করতে ঘরে ফিরে যাচ্ছে। কবীর প্রকাশ্যে কিছু বললেন না— কিন্তু মনে মনে তিনি অনুক্ষণ এ সমস্ত ভাবতে লাগলেন: 'আমার প্রভু কত দয়ালু। তিনি ছাড়া এত মান আমার কে বাড়াবে। তিনি ছাড়া কে আমাকে এমন অভয় আশ্রয় দেবে?' এ-রকম ভাবতে ভাবতে ভগবানের প্রতি তাঁর ভক্তি আরও দৃঢ় হল।

হতে পারে যে এই কাহিনীটি অতিরঞ্জিত তবুও এ থেকে জানতে পারা যায় যে নিজের পরিবার-পরিজনকে ভরণ-পোষণের ভাবনা কবীর সাহেবের কারও চেয়ে কম ছিল না। আবার সাধুসন্তদের সেবাপরিচর্যার জন্য তাঁর চিন্তাভাবনা হত আরও বেশি। নিজে কষ্ট স্বীকার করে অভ্যাগতদের সুখ-শান্তি বিধানের চেষ্টা কবীর সাহেব সর্বদাই করতেন।

এই ধরণের ঘটনা উপলক্ষ্যে যখন কবীর সাহেবের নাম ছড়াতে লাগল তখন থেকেই তাঁর কাছে লোকের ভিড়ও বেড়ে চলল। এতে ভগবানের ভজনপূজনের কাজে বাধা

ঘটতে লাগল। এই অসুবিধার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার এক উপায় তিনি খুঁজে বের করলেন। একদিন সকালবেলা তিনি এক বারবণিতার ঘরে গেলেন, এবং তার কাঁধে হাত রেখে সদর রাস্তায় চলতে লাগলেন। তার সঙ্গে ভগবানের পাদোদক ছিল। তিনি সেই চরণামৃত পথচারীদের দেখিয়ে দেখিয়ে এমন ভাবে পান করতে লাগলেন, যা দেখে সকলে মনে করে যে কবীর মদ্যপান করছে। তিনি এমন এক অবস্থায় বাজারের মধ্য দিয়ে গেলেন, যে তাঁকে দেখে সকলেরই মনে হল— তাঁর ধ্যানজ্ঞান সবই নষ্ট হয়েছে। শহরে একটা সাড়া পড়ে গেল। এখানে ওখানে লোকজন জড়ো হয়ে কবীরের কথা বলে বলে হাসাহাসি করতে লাগল। সবাই বলতে লাগল, "ভক্তিধর্ম সকলেই চায়, কিন্তু নীচ জাতের লোকের ভক্তি কদিন আর থাকে। কবীরও দিন-দশেক খুব ভক্তিভাব দেখাল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে নিজেই বুঝিয়ে দিল যে সে জাতে জোলা ছাড়া আর কিছু নয়! তাই তো দেখ সেই সাধু এখন বেশ্যাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছে।"

কবীর সাহেব ঐ অবস্থাতেই ওখানকার রাজার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। যে রাজা এর আগে কবীরকে স্বাগত সম্ভাষণ করে সবিনয় সমাদরে সিংহাসনে ডেকে বসাতেন, তিনিই আজ কবীরের অবস্থা দেখে চমকে উঠলেন। তিনি কবীরকে কাছে না ডেকে রাজসভার বাইরে বসতে আদেশ দিলেন। সভাসুদ্ধ সকলে হতবুদ্ধি হয়ে ভাবতে লাগল যে কেমন করে কবীরদাসের মতো ভক্তের এমন অধঃপতন হল!

ঐ সময় হঠাৎ কবীরদাস নিজের গাড়ু থেকে খানিকটা

জল ছিটিয়ে দিলেন। কবীরের এই কাণ্ড দেখে রাজা আরও অবাক হয়ে গেলেন। কবীরকে এই জল ছিটানোর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, "আমার মুখের কথা তো কারও বিশ্বাস হবে না। তবু বলি যে জগন্নাথের একজন পাণ্ডা সতিসত্যিই আগুনে পুড়ে যাচ্ছিল, তাকে বাঁচাবার জন্যই আমি একটু জল ছিটিয়েছি।"

মুহূর্তের মধ্যে রাজা একখানি চিঠি লিখে দূতের হাতে দিলেন। দূত চলল জগন্নাথ—উদ্দেশ্য কবীরের কথার সত্যাসত্য নির্ণয়। দূত চলে গেলে পর কবীরও উঠে চলে এলেন নিজের ঘরে। দশদিন পর রাজদূত পৌছল এসে জগন্নাথে। সেখানে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারল যে ভাতের ফেন গড়াবার কালে হাঁড়ি ফেটে গিয়ে সত্যি সত্যি এক পাণ্ডার হাত পুড়ে যাচ্ছিল। সেই পাণ্ডা নিজেই রাজদূতকে বলেছে কবীর সাহেবই জল ছিটিয়ে তাকে জ্বালাপোড়া থেকে রক্ষা করেছেন। কথা শুনে দূতেরও বিস্ময় হল। আরও নিঃসন্দেহ হবার জন্য দূত পাণ্ডাকে আবার জিজ্ঞাসা করল যে কোন্ কবীর সাহেবের কথা সে বলছে? পাণ্ডা বলল যে যিনি জাতিতে জোলা এবং নিবাস যাঁর কাশীধামে সেই মহাত্মা কবীরের কথাই সে বলছে। পাণ্ডা আরও বলল যে কবীর সাহেব তো প্রতিদিনই জগন্নাথজীকে দর্শন করতে আসেন। এই কথা শুনে দূতের বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। কাশীতে ফিরে এসে দূত কবীরের সমস্ত কথা রাজাকে বললে রাজা বড়ই সমস্যায় পড়লেন। কবীরের প্রতি তিনি সেদিন যে অভদ্র ব্যবহার করেছেন সে-কথা স্মরণ করে মনে মনে অনুতপ্ত হলেন। তিনি স্থির করলেন যে স্বকৃত অপরাধের জন্য

মার্জনা চাইবেন তিনি কবীর সাহেবের কাছে এবং যেভাবে পারেন তাঁকে খুশি করবেন। কিন্তু কবীরকে খুশি করা তো মুখের কথা নয়— কারণ তিনি তো আর-কারও উপহার গ্রহণ করেন না। রাজা এক উপায় স্থির করলেন। পরিবারবর্গ সকলকে সঙ্গে করে কাঠের বোঝা নিজের মাথায় নিয়ে আর গলায় কুড়াল ঝুলিয়ে রাজা এলেন কবীর সাহেবের কাছে। তখনকার দিনে কারও কাছে ক্ষমা প্রার্থনার এই ছিল রীতি। রাজাকে ক্ষমাপ্রার্থীর বেশে আসতে দেখে কবীর সাহেব দূরে থেকেই তাঁর মাথার বোঝা ও গলার কুড়াল নামিয়ে নিতে বললেন। পরে রাজাকে সমাদর করে বসালেন আর বললেন, "তুমি নিজে বড় তাই আমাকেও বড় বলে সম্মান দিতে এসেছ। কেবল তার পক্ষেই সৎ ও অসতের তফাত বোঝা সম্ভব যে জন সত্যিকারের বড়। মূর্খ নীচাশয় কি বুঝবে তার ?"

এই ভাবে কবীর যত তাঁর গুণ গোপন করতে চান ততই তাঁর কীর্তি ও মহত্ত্ব বেশি করে প্রকাশ হয়ে পড়ে।

উপরে লিখিত গল্পে জগন্নাথের পাণ্ডার ঘটনা সাধারণের অবিশ্বাস্য মনে হলেও দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষরা তা অসম্ভব বলে মনে করেন না। বারবণিতার ঘটনাটিকে সত্য বলে মনে করলেও ক্ষতির কারণ নেই। কারণ কবীর সাহেব স্বভাবতঃই ছিলেন নির্ভীক ; লোকনিন্দাকে তিনি পুষ্পচন্দন বলে মনে করতেন। কবীরপন্থীদের গ্রন্থে কিন্তু এই দুইটি ঘটনার উল্লেখ খুব বেশি নেই। তবে ধর্মদাস সাহেব তাঁর রচিত 'শব্দাবলী'তে মহাত্মা কবীরের বারবণিতার কাঁধে হাত রেখে পথ চলার ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন।

কবীর সাহেবের প্রতিপত্তি দিন দিন বেড়েই চলছে দেখে কাশীর কাজী ও ব্রাহ্মণরা ঈর্ষার আগুনে জ্বলতে লাগলেন। কিভাবে কবীরকে অপমানিত করা যায় এই ছিল তাঁদের দিনরাত্রির চিন্তা। ঐ সময় লোদীবংশের সুলতান এবং দিল্লীর সিংহাসনের অধিপতি সিকন্দর শাহ্‌ কাশীতে এসেছিলেন, তিনি দাহ-রোগে ভুগছিলেন। দেহে তাঁর ফোস্কা উঠেছিল। রোগযন্ত্রণায় তিনি অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। হেকিম, বৈদ্য, সকলেই তাঁর চিকিৎসা করলেন, কিন্তু তিলমাত্র উপশম হল না তাঁর ব্যাধির। লোকে বলে সুলতানের স্বজনেরা তাঁকে স্বামী রামানন্দ এবং কবীর সাহেবের ঐশ্বরিক শক্তির কথা বলেছিল। সেইজন্যই তিনি কাশীতে এসেছিলেন দুই মহাপুরুষের কৃপা-লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে।

রামানন্দজী ম্লেচ্ছদের মুখদর্শন করতেন না বলে সিকন্দর শাহ্‌ তাঁর কাছে গিয়েও ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে এলেন, কিন্তু কবীর সাহেব তাঁকে দর্শন দিলেন। শুধু তাই নয়, লোকে বলে কবীর সুলতানের রোগও কেড়ে নিলেন। সুলতান ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে মহাত্মা কবীরের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। পরে কবীর সাহেবের সুপারিশে তিনি রামানন্দজীরও দর্শন পেয়েছিলেন বলে শোনা যায়। এ-সমস্ত ঘটনার পর সিকন্দর শাহ্‌ কবীর সাহেবকে এত বেশি ভক্তি করতে লাগলেন যে তা দেখে তাঁর পীর শেখ তকী ঈর্ষায় জ্বলতে থাকলেন। তিনি ভাবলেন যে বাদ্‌শার এই হিন্দু ফকীরকেও গুরু বলে স্বীকার করার অর্থ হল একই খাপে দুটি তলোয়ার রাখা— কিন্তু এ-তো অসম্ভব। এই আতঙ্কে তিনি বিব্রত হয়ে কবীর সাহেবকে সমূলে উৎখাত করার ফন্দা আঁটিতে লাগলেন। আবার কাশীর কাজী,

মৌলবী, ফকীর প্রভৃতি দল বেঁধে কবীরের সম্বন্ধে নানা অভি-যোগ নিয়ে এই সময়েই শেখ তকীর কাছে এসে হাজির হলেন।

অনন্তদাস তাঁর 'পরচঈ' গ্রন্থে বাদশা সিকন্দরের কাশী আগমনের সংবাদ লিপিবদ্ধ করেছেন, কিন্তু বাদশার ব্যাধি বা তাঁর সঙ্গে শেখ তকীর যোগাযোগের কোনো ঘটনার উল্লেখ তিনি করেননি। তিনি লিখেছেন যে সিকন্দর শাহের আগমণের সঙ্গে সঙ্গেই কাজী, মোল্লা, ব্রাহ্মণ, বণিক সকলে মিলে তাঁর কাছে কবীরের কুৎসা কীর্তনের জন্য হাজির হয় এবং বলে, "হে মহান্, আপনি আমাদের ভাগ্যবিধাতা, আমাদের দুর্গতি দূর করুন। এক জোলার দৌরাত্ম্যে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। এই জোলা মুসলমান ধর্মের রীতিনীতি বিসর্জন দিয়েছে, আবার হিন্দুধর্মের নিন্দাতেও সে পঞ্চমুখ। তীর্থধর্ম আর বেদব্রাহ্মণ তাঁর চক্ষুশূল। শঙ্কর, শারদা গণেশাদি দেব-দেবীর নাম শুনতে পারে না জোলা। একাদশী উপবাসাদি ব্রতপূজা এবং পুরোহিতকে সে দেখতেই পারেনা। মোটকথা হিন্দু বা মুসলমান দুই ধর্মমতই সে ছেড়ে দিয়েছে; নিজে এক নূতন পথ নিয়ে সেই পথেই ইচ্ছামতো চলছে। নিজেই সে নাকি ঈশ্বর বা খোদা। এই জোলা যতদিন কাশীতে থাকবে ততদিন কেউ পণ্ডিত বা কাজীকে গ্রাহ্য করবে না। কাজেই বাদশাহের কাছে প্রার্থনা: আপনি এই জোলাকে শহর থেকে বের করে দিন। বাদশা আমাদের মা-বাপ, আপনার সন্তানদের রক্ষা করুন।" কবীরের বৃত্তান্ত শুনে বাদশা তখনই দুজন পেয়াদা পাঠিয়ে কবীর সাহেবকে ডেকে আনলেন। বাদশাকে অভিবাদন জানাতে বললে কবীর সাহেব কাজীর আদেশ অমান্য করলেন। বাদশা নিজেকে অপমানিত বোধ

করে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, "হতভাগা জোলা, তুই নিজের দৈন্য-দুঃখ ভুলে গিয়ে দুর্বুদ্ধি আশ্রয় করেছিস ?" কবীর শান্তভাবে সংযত ভাষায় উত্তর দিলেন, "আমি দীন হতে পারি, কিন্তু হিন্দু বা মুসলমান কারও কৃপার ভিখারী নই। গুরুর কাছে মহাধন রাম নাম পেয়েছি। রামের ভজনা করি, তাঁরই গুণগান করি। রামের কৃপায় বাদ্‌শা-ভিখারী সবাই আমার কাছে সমান। কাউকেই আমি ভয় করি না।"

কাজী বিচার করে রায় দিলেন, "মুসলমান ধর্মের নিন্দা করে বলে কবীর অবিশ্বাসী (কাফের)। কাজেই এর গলা থেকে জপমালা ছিনিয়ে নাও, কপালের তিলক মুছে দাও, বেতমিজকে পাথর ছুঁড়ে মারো।"

কবীর সাহেব কাজীকে এবার বললেন, "অবিশ্বাসী (কাফের) তো তুমি। বলতো দেখি, গরু যে জবাই করো,ছাগল, মুরগী প্রভৃতি কেটে যে ভোজে লাগাও, এ-সমস্ত প্রাণী-হত্যার আদেশ তুমি কোথায় পেয়েছ ? জান না তো নির্মমভাবে যারা প্রাণীহত্যা করে যমরাজ তাদের শাস্তি দেন বুকের পাঁজর ভেঙে। আমার যমের ভয় নেই, রামনামে আমি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে আছি। আমি যমকেও ভয় করি না।"

কবীরের মুখে এ-সমস্ত কথা শুনে বাদ্‌শা বাঘের মতো গর্জে উঠলেন, "কে আছো, এই বেইমানের হাত-পা শিকল দিয়ে শক্ত করে বেঁধে গঙ্গার জলে ফেলে দাও।"

জল্লাদ যথারীতি হুকুম মতো কাজ করল। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় জলে পড়েও কবীরদাস এতটুকু ভয় পেলেন না। তিনি অবিচল বিশ্বাসে পরমাত্মাকে স্মরণ করলেন মনে মনে। অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই এক অবিশ্বাস্য ঘটনা

ঘটল। আপনা থেকে কবীরের হাত-পায়ের বাঁধন ছিঁড়ে গেল। তিনি ডুবে গেলেন না জলে। একখানি কাঠের চৌকিতে যেমন করে কেউ বসে কবীরসাহেব ঠিক তেমনি ভঙ্গিতে জলের ওপর শান্তভাবে ভেসে বসে রইলেন।

কোনো কোনো গ্রন্থে লিখিত আছে যে কবীরসাহেবকে পরীক্ষা করার জন্য বাদ্‌শা একটি মৃত গাভী আনিয়ে রাখলেন তাঁর সামনে আর বললেন, "যদি তুমি ঈশ্বরের সমান শক্তিমান তাহলে এই গাভীটিকে বাঁচিয়ে দাও।"

শোনা যায় কবীর সাহেবের স্পর্শমাত্রেই এই মৃত গাভীটি প্রাণ ফিরে পেয়েছিল।

কিন্তু এই ধরণের ঘটনা সাধু নামদেবের জীবনীতে অনেক রয়েছে। তাই অনুমান হয়, নামদেবের জীবনের ঘটনাগুলি কালে কালে কবীর সাহেবের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে।

যাহোক, যখন কবীর সাহেবকে জলে ডুবিয়ে মারা গেল না, তখন তাঁর শত্রুরা আবার এক নূতন অভিযোগ খাড়া করল। তারা বলল যে কবীর জাদু জানে, অথবা কোনো তন্ত্রমন্ত্রের শক্তিতে সে শক্তিমান্। কাজেই তাঁকে যেমন করে হোক শেষ করে ফেলতে হবে।

এবার তাঁর হাত-পা বেঁধে তাঁকে একটা বন্ধ ঘরের ভিতরে রেখে চারিদিক থেকে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল। এবারও ভগবান তাঁকে রক্ষা করলেন। ঘরটা পুড়ে খাক হয়ে গেল। ঘরের ছাই বাতাসে উড়ল; কিন্তু কবীর সাহেবের একটি লোমকূপও আগুন স্পর্শ করতে পারল না। ভক্ত হিসেবে কবীর প্রহ্লাদেরই সমান।

ভক্ত প্রহ্লাদকে নিধন করার জন্যও এমনই এক অগ্নিকুণ্ড তৈরি করা হয়েছিল। সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণেই হয়তো কবীর সাহেবেরও ভাগ্যে অগ্নি পরীক্ষা জুটেছিল। তবে তিনিও প্রহ্লাদের মতো সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন।

সিকন্দরশাহ্ অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন যে সামান্য একটা জোলা এমন সব নাটকীয় কাণ্ড করেছে! কত কলকৌশলই না ওর জানা আছে! বাদ্‌শা নিরস্ত হলেন না তবু! আবার কবীর সাহেবকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে নিয়ে এসে এক মদমত্ত হস্তীর পদতলে ছুড়ে দিলেন—যে হাতী নিজের ছায়াকে পা দিয়ে পিষতে যায়, মাহুতকেও যে গ্রাহ্য করে না। বড় বড় বাহাদুর যোদ্ধাকেও সেই হাতী যুদ্ধক্ষেত্রে পিষে মেরেছে; সেই মদমত্ত হস্তীরই নাম রাখা হয়েছে 'রণজিৎ'। এই 'রণজিৎ'-এরই পায়ের তলায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল কবীর সাহেবকে। ক্ষ্যাপা হাতীর ভয়ে সমস্ত লোক দূরে পালিয়ে গেল; কিন্তু হাতী যখন কবীরকে দেখল, সে যেন কি রকম হকচকিয়ে গেল; কবীরকে আক্রমণ কবা তো দূরের কথা, কবীরের ভয়ে সে প্রাণপণে ছুটে পালাল। এমন ঘটনা এর আগে কখনও আর ঘটেনি। এমন অদ্ভুত কাণ্ড কেউ কখনও দেখেনি।

শোনা যায় সেই হস্তী 'রণজিৎ' নাকি কবীর সাহেবের স্থলে এক হিংস্র ব্যাঘ্র দর্শন করেছিল—যার সঙ্গে জোরে সে এঁটে উঠতে পারত না। সেজন্যই সে ভয় পেয়ে পালিয়েছিল। সে যাই হোক কবীরদাস তো আর কিছুই জানতেন না। তিনি কেবল ত্রিলোকেশ্বর রামকেই জানতেন এবং তাঁরই শরণাপন্ন হতেন। শরণাগত ভক্তকে ভগবান রক্ষা না করেই

পারেন না ; তাই মত্তহস্তীর পায়ের তলা থেকেও তিনি ভক্ত কবীরকে কুড়িয়ে নিলেন।

শেখ তকী আর বাদ্‌শা সিকন্দর বারে বারে নানাভাবে কবীর সাহেবকে পরীক্ষা করে দেখেছেন ; কিছুতেই একটা দরিদ্র জোলার সঙ্গে তাঁরা এঁটে উঠতে পারলেন না। কবীরকে পরাস্ত করতে গিয়ে নিজেরাই পরাজয় স্বীকার করলেন কবীর সাহেবের কাছে ; শুধু কি তাই— শেষ পর্যন্ত ক্ষমা ভিক্ষা চাইলেন জোড়হাতে।

সন্ত সমাজে সুপ্রাচীন কাল থেকেই এই ধারণা বদ্ধমূল যে কবীর সাহেব সিকন্দর লোদীর সময়ে বর্তমান ছিলেন। এ কথাও তাঁরা বলেন যে কবীর-সিকন্দর সাক্ষাৎকার হয়েছিল। শুধু তাই নয়, কবীরের প্রতি অন্তত তিন প্রকারের শাস্তিমূলক পরীক্ষাও যে প্রয়োগ করা হয়েছিল, সে কথাও তাঁরা সমর্থন করেন।

প্রিয়াদাসজী তাঁর ভক্তমালের টীকায় উক্ত ঘটনাবলীর উল্লেখ এইভাবে করেছেন—

দেখি কৈ প্রভাব ফেরি উপজ্যো অভাব দ্বিজ।
আয়ৌ বাদশাহ জু সিকন্দর সৌ নাব হৈ॥
বিমুখ সমুহ সঙ্গ মাতা হু মিলাই লঈ।
আই কে পুকারৈ জু দুখায়ে সব গাঁব হৈ।
লাও রে পকরি বাকো দেখোঁ রে মকর কৈসো।
অকর মিটাউঁ গাঢ়ে জাকর তনাব হৈ॥
আনি ঠাঢ়ে কিয়ে কাজী কহত সলাম করৌ।
জানৈ ন সলাম জামৈ রাম গাঢ়ে পাব হৈঁ॥

অতঃপর উপরে বর্ণিত তিন প্রকার শাস্তিরও উল্লেখ পাওয়া যায়। সন্ত দাহুদয়ালের শিষ্য রজ্জবজীও বলেছেন,

জন কবরী জড়ি জংজীর বোরে জল মাঁহী।
অগ্নি নীরগজ ত্রাস রাখে কিধৌ নাহীঁ॥

রোহতক জেলার ছুড়ানী নিবাসী গরীবদাস সাহেবও তাঁর গ্রন্থসাহেবে এ বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এই যে কবীরদাসের রচিত হুটি পদেও তাঁকে গঙ্গায় ডোবানোর এবং হাতীর নীচে ফেলে দেওয়ার বর্ণনা পাওয়া যায়। যথা—

গঙ্গায় নিক্ষেপ বিষয়ে—

মন ন ডিগৈ তনু কাহে কৌ ডেরাই।
চরণ কমল চিতু রহ্যো সমাই॥
গংগ পুসাইনি গহির গম্ভীর।
জংজীর বাঁধি করি খরে কবীর॥
গংগা কী লহরি মেরী টুটি জংজীর।
মৃগছালা পর বৈঠে কবীর।
কহৈ কবীর কোঈ সংগ ন সাহ।
জল থল মে রাখৈ রঘুনাথ॥

হস্তীর পদতলে নিক্ষেপ বিষয়ে—

আহি মেরে ঠাকুর তুমহরা জোর।
কাজী বাকিবো হস্তী তোর॥
ভুজা বাঁধি মিলা করি ডারয়ৌ।
হস্তী কোপি মুড় মহি মারয়ৌ॥

ভাগ্যো হস্তী চীসা মারী।
যা মুরতি কী হেঁৗ বলিহারী॥
রে মহাবত তুঝু ডারউঁ কাটি।
ইসহি তুরাবহু খালহু সাঁটি
হস্তী ন তোরৈ ধরৈ ধিয়াঁন।
বাকে হৃদৈ বসৈ ভগবান॥
ক্যা অপরাধে সন্ত হৈ কোন্ হাঁ।
বাঁধি পোটি কুঞ্জর কৌ দীনহাঁ॥
কুঞ্জর পোট বহু বন্দন করৈ।
অজহুঁ ন সুঝৈ কাজী অন্ধরৈ॥
তীনি বৈর পতিয়ারা লীনহাঁ।
মন কঠোর অজহুঁ ন পতীনা।
কহৈ কবীর হমরা গোবিন্দ।
চউথে পদ মহি জন কী জিন্দ॥

তৃতীয় একটি পদে আগুনে পুড়িয়ে মারার কথাও জানা যায়—

রাম জপত তনু জরি কিন জাই।
রাঁম নাঁম চিতু রহ্যো সমাই॥
আপহি পাবক আপহিঁ পবনা।
জারৈ খসমত রাখৈ কবনাঁ॥
কাকো জরৈ কাহি হোই হাঁলি।
নটবিধি খেলৈ সারঙ্গপানি॥

কহৈ কবীর অকথর দুই ভাখি।
হোইগা খসম ত নেইগা রাখি॥

আসল কথা হল উল্লিখিত পদগুলি এত প্রাচীন পুঁথিতে লিপিবদ্ধ আছে যে এগুলিকে কবীরসাহেবের স্বরচিত মূল পদ বলে স্বীকার করতে এ পর্যন্ত কেউই আপত্তি করেননি। এই কারণেই উপরে বর্ণিত তিনটি ঘটনাকেই সত্য ঘটনা বলে মেনে নেওয়া চলে। উপরে উদ্ধৃত পদে 'তীন বের পাতিয়ারা লীন্হা' থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে কবীরসাহেবকে তিনটি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন অবশ্যই হতে হয়েছিল। আমরাও শেষ পর্যন্ত জানতে পারি যে বার বার কঠিন পরীক্ষার পরেও কবীর-সাহেব বিজয়ী। সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বজনশ্রদ্ধেয় মহাত্মা রূপে তিনি স্বীকৃত। পরবর্তী প্রায় সকল মহাপুরুষই অল্পবিস্তর মহাত্মা কবীরের প্রভাবে প্রভাবিত। কেবল কথা দিয়ে মানুষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। হাতে-কলমে কিছু করে দেখানোও প্রয়োজন। অবশ্য, বিংশ শতাব্দীর খুব অল্পসংখ্যক লোকই এই ঘটনাগুলি বিশ্বাস করবে। কিন্তু আমাদেরও এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে অবজ্ঞা ও অব-হেলায় আমরা অনেক আধ্যাত্মিক সম্পদ নষ্ট করেছি। কবীর-সাহেব এক মহাযোগী তপস্বী ছিলেন। তাঁর সাধনা এত উচ্চ স্তরের ছিল যে মাটি, জল, আগুন প্রভৃতি পঞ্চভূত তাঁর ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। আজও হয়তো কত সিদ্ধ মহাপুরুষ বাঘ, চিতাবাঘ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুজানোয়ারের পাশে নির্জন অরণ্যে বসে পরমাত্মার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত। আমরা কতটুকুই বা তাঁদের খবর রাখি। কোন্ অদৃশ্য শক্তি

তাঁদের সেই হিংস্র পশুর হাত থেকে রক্ষা করে, আমরা কি তা জানি ? সেজন্যই কবীরের মতো সমদর্শী মানবের জীবনের এই গল্পের চেয়ে রোমাঞ্চকর ঘটনাগুলিকেও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

কিন্তু সিকন্দর লোদীই যে কবীরের ওপর সমস্ত নির্যাতন করেছেন, এ-কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। কবীর সাহেব যে সিকন্দর লোদীর সময়ে বর্তমান ছিলেন এই অনুমানও অভ্রান্ত নয়। আমরা ইতিহাস মারফত জানি যে ১৫৪৫ থেকে ১৫৭৫ সংবৎ পর্যন্ত সিকন্দর রাজত্ব করেছিলেন। ঐতিহাসিকদের মতে ১৫৫১ সংবতে শিকন্দর কাশীতে এসেছিলেন ; কিন্তু আমরা আরও অতীতে উপস্থিত হলে পর দেখি যে ১৫০৫ সংবতেই সম্ভবতঃ কবীরসাহেব দেহত্যাগ করেন। কেউ কেউ যদিও ১৫৭৫ সংবতে কবীরসাহেবের লোকান্তর স্বীকার করেছেন, তবু ইতিহাস আমাদের বলে না যে কবীরে-সিকন্দরে দেখাসাক্ষাৎ হয়েছিল। লোদী সাহেব হিন্দু নির্যাতনের জন্য কুখ্যাত। সম্ভবত এই কারণেই কবীর-সাহেবের জীবনীকারগণ কবীর-নির্যাতনের যাবতীয় ঘটনা হতভাগা সিকন্দরের মাথায় চাপিয়ে দিয়েছেন। আবার সংশ্লিষ্ট লোকে যার যেমন খুশি রঙ লাগিয়েছে। কবীরপন্থী কোনো কোনো গ্রন্থে আবার সিকন্দর লোদীকে 'মহান্' আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে। 'মহান্' সিকন্দরের আরও একটি বিশেষণ আছে 'জুলকরনৈন'। লোকে এই শব্দটির নানা রকম অর্থ করে থাকে। গ্রীস দেশের লোকে দুই শৃঙ্গযুক্ত একপ্রকার শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করত। এইজন্য লোকে ওদের বলত 'দুইশৃঙ্গী'। আবার কারও কারও

ধারণা এই যে যিনি পূর্ব ও পশ্চিম দুই দিক জয় করেছেন তিনিই এই আখ্যা লাভ করেছেন। কেউ বা আবার উক্ত 'জুলকরনৈন' শব্দের অর্থ করেন 'ভাগ্যবান্'। কিন্তু 'কমলা-বোধ' নামক কবীরপন্থীদের একখানি গ্রন্থে এই শব্দের অর্থ করা হয়েছে 'জোলাকৃত' বা 'জোলা-রক্ষিত'। অর্থাৎ জোলা কবীর যাঁকে উপদেশ দিয়ে মানুষ করেছেন, অথবা পতন থেকে রক্ষা করেছেন তিনিই হয়েছেন 'জূলকরনৈন'।

ভয়ে মুরীদ জুলহা কে আঈ।
তবহী জুলকরণ নাম ধরাঈ॥

সিকন্দর শাহের প্রসঙ্গে শেখ তকী নামে যাঁর উল্লেখ করা হয়েছে প্রথমে অনেকেই ভুলক্রমে তাঁকে কবীর সাহেবের গুরু বলে মানতেন। এই ভুলের গোড়াপত্তন করেছিলেন মৌলানা গোলাম 'সরকার' সাহেব। তাঁর রচিত 'খজীনতুল অসফিয়া' গ্রন্থে লিখেছেন "শেখ কবীর জোলা শেখ তকীর শিষ্য ছিলেন। ইনিই সর্বপ্রথম পরমাত্মা এবং তাঁর ধ্যানধারণা সম্বন্ধে হিন্দী ভাষায় লেখনীধারণ করেন। অপার সহিষ্ণুতার জন্য হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের লোক তাঁর নেতৃত্ব স্বীকার করেছিল। হিন্দুরা তাঁকে বলত 'ভগত' আর মুসলমানেরা বলত 'পীর'। সন ১৫৯৪ ই. অথবা ১৬৫১ সংবতে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর গুরু শেখ তকী মারা যান ১৫৭৫ সনে অথবা ১৬৩২ সংবতে।"

উদ্ধৃতি থেকে অনুমান হয় ভক্ত কবীরের কথাই 'সরবর' বলেছেন; কিন্তু তিনি কবীর সাহেবের মৃত্যুর যে তারিখ দিয়েছেন তাতে সন্দেহ থাকে না যে তিনি অন্য একজন সূফী-

পন্থী শেখ কবীর নামক সন্তের সঙ্গে কাশী নিবাসী ভক্ত কবীরসাহেবকে গুলিয়ে ফেলেছেন।

কবীরসাহেবের প্রসঙ্গে শেখ তকীই বা কেমন করে এলেন এবার সে-কথা বলা যাক। 'কবীর'-বীজক নামে পরিচিত কবীরের বাণীর যে সংকলনকে কবীরপন্থীরা কবীরের মূল রচনা বলে মানেন তাতে দুই স্থলে শেখ তকীর নাম পাওয়া যায়। প্রথমে ৪৮ সংখ্যক রমৈনীতে বলা হয়েছে—

মানিকপুর কবীর বসেরী।
মদ্দতি সুনী শেখ তকী কেরী॥

এ থেকে জানা যায় যে কবীরসাহেব যখন মানিকপুরে গিয়েছিলেন তখন তিনি জনৈক শেখ তকীর খুব প্রশংসা শুনে-ছিলেন। অতঃপর ৬৩ সংখ্যক রমৈনীতে এ রকম একটি দোহা পাওয়া যায়—

নানা নাচ নচায় কে, নাচৈ নটকে ভেখ।
ঘট ঘট অবিনাসী অহৈ, সুনহু তকী তুম শেখ॥

এ থেকে জানা যায় যে উক্ত শেখ তকী ব্রহ্ম সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। তাছাড়া এই দুই মহাত্মার মধ্যে সাক্ষাৎকারও ঘটেছিল।

কিন্তু এদিকে আবার লোকেরা প্রমাণ করে দিয়েছে যে 'বীজক'-এ সংকলিত পদগুলি কবীরসাহেবের দেহত্যাগের বহুদিন পরে রচিত হয়ে থাকবে। তা ছাড়া বীজকে যত পদ আছে তার সবগুলিকেই কবীরসাহেবের মূল রচনা বলে মেনে নিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। বীজকে কবীরের

মূল পদের চেয়ে পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্ত পদের সংখ্যাই বেশি। এজন্য প্রথমেই এ-কথা বলা যায় যে বীজকাশ্রয়ী কবীর-জীবনীকে আর যাই হোক অন্ততঃ প্রামাণিক বলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ কবীরসাহেবের সমসাময়িক বা তাঁর গুরু বলে পরিচিত শেখ তকী নামক কোনো ব্যক্তির কথা ইতিহাসে নেই। শেখ তকী নামে স্যূফী মতাবলম্বী দুজন বিখ্যাত পীরের নাম অবশ্য জানা যায়। তাঁদের একজনের নিবাস ছিল কড়ে-মানিকপুর; আর অন্যজন ছিলেন এলাহাবাদের নিকটবর্তী ঝুঁসী নিবাসী। প্রথমোক্ত পীর লোকান্তরিত হন কবীরসাহেবের লোকান্তরিত হবার প্রায় একশো বছর পর; আর শেষোক্ত পীরের স্বর্গলাভ হয় কবীরসাহেবের জন্মের প্রায় একশো বছর পূর্বে। সেই অনুসারে এই মহাত্মাদের কিভাবে কবীর-সাহেবের সমকালীন বলে মেনে নেওয়া যায়? অনুমান হয়, বীজকের যে রমৈনীগুলির কথা একটু আগে বলা হয়েছে, পরবর্তীকালে সেগুলিকে কোনো-না কোনো ভাবে কবীরের মূল বাণীর মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদি বীজককে নিখাদ বলে মেনে নেওয়া হয়ও, তবু তাতে এমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না, যার ওপর নির্ভর করে বলতে পারা যায় যে শেখ তকী কবীরসাহেবের গুরু ছিলেন। যদি মেনে নেওয়া যায় যে, দুজন একই সময়ে বর্তমান ছিলেন— তাহলে সেটাই আমাদের পক্ষে অধিকন্তু।

সে যাই হোক 'নির্ভয়জ্ঞান' 'অনুরাগসাগর' প্রভৃতি কবীরপন্থী গ্রন্থে শেখ তকী এবং কবীরসাহেব সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে। তাতে বলা হয়েছে যে শেখ তকী বাহান্ন বার কবীরকে পরীক্ষা করেছিলেন। এই ব্যাপারটি 'বাওয়ন

কসনী' বা 'বাহান্ন কাষ্ঠি' নামে পরিচিত। তা থেকে কয়েকটি গল্প আগেই বলা হয়েছে। সেগুলি ছাড়াও আর দুটি এমন গল্প আছে যেগুলি এখানে বলা আবশ্যক। এই দুটি গল্প 'কমাল আর কমালীর' জীবন দান করার ঘটনা অবলম্বনে রচিত।

শোনা যায় সিকন্দর লোদী যখন কবীর সাহেবের কার্যকলাপ নিজের চোখে দেখলেন তখন তাঁর প্রত্যয় হল যে সত্যিই কবীরসাহেব একজন সিদ্ধপুরুষ। দিল্লীতে ফিরে যাবার সময় তিনি কবীরসাহেবকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যাবার বাসনা জানালেন। কবীরসাহেব সম্মত হলে সিকন্দর তাঁর সব চেয়ে সুন্দর হাতীটিকে সিদ্ধপুরুষের বাহনের জন্য সাজালেন। তার পর নির্দিষ্ট দিনে কবীরসাহেবকে নিয়ে তিনি রওয়ানা হলেন।

প্রয়াগ রাজ্যের ত্রিবেণীর তীরে পৌঁছে সুলতান তাঁর সৈন্য-সামন্তকে শিবির সন্নিবেশ করতে আদেশ দিলেন। একদিন শিবিরে ভোজনাদি শেষ করে সবাই যখন নিশ্চিন্ত মনে বসেছে তখন কবীরসাহেব সকলকে উপদেশ দিতে লাগলেন। সকলে যখন নিবিষ্টমনে উপদেশ শুনছে সে সময় নিকটস্থ গঙ্গার স্রোতে একটি ছোট শিশুর মৃতদেহ পশ্চিম থেকে পূব দিকে ভেসে যাচ্ছিল। শেখ তকী তখন সুলতানকে বলল, "জাঁহাপনা, কবীরসাহেব তো নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করেন, যদি সত্যি তাই হয়, তবে তো তিনি এই মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করতে পারেন। তিনি এই মৃত শিশুটিকে যদি বাঁচিয়ে তুলতে পারেন, তাহলে আমরাও তাঁকে খোদা বলে মেনে নেব।" এই কথা শুনে কবীরসাহেব হাত উঁচু করে জলে ভেসে যাওয়া মৃত শিশুটিকে তাঁর দিকে

আসতে ইশারা করলেন। সবাই অবাক হয়ে দেখল যে মৃত শিশুটি দ্রুতবেগে কবীরসাহেবের কাছ পর্যন্ত এসে থামল। কবীরসাহেব পরমাত্মার ধ্যানে মগ্ন থেকে বললেন,

"এই মৃতদেহে আবার আত্মার অধিষ্ঠান হোক।" সবাই দেখতে পেল যে কবীরসাহেবের হাত থেকে যেন এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বেরিয়ে এসে শিশুটির মৃতদেহের মধ্যে গিয়ে মিশে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই শিশুটি চোখ মেলে তাকাল। তার পর জল থেকে উঠে এসে শিশুটি কবীরসাহেবের পায়ে লুটিয়ে পড়ল। এই অলৌকিক কাণ্ড দেখে শাহ্ সিকন্দর বললেন, সাবাস্! আপনি তো কামাল (অসাধ্য সাধন) করলেন!" উত্তরে কবীরসাহেব বললেন, "আপনি কামাল শব্দটি এ প্রসঙ্গে উচ্চারণ যখন করলেন তখন এই শিশুটি 'কামাল' নামেই বিখ্যাত হবে।"

এবার সিকন্দর কামালের পূর্বজন্মের কথা শুনতে চাইলে কবীরসাহেব শিশুটির দিকে ইশারা করে বললেন, "ওহে কামাল, তোমার পূর্বজন্মের কাহিনী শোনাও তো দেখি।" শিশু বলতে শুরু করল, "কয়েক বছর আগে উত্তর খণ্ডে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে আমার জন্ম হয়। আমার একটি বোনও ছিল—আমরা দুজনে পূর্বজন্মের সংস্কারবশে হিমালয়ে তপস্যা করতে যাই। আমাদের তপে তুষ্ট হয়ে মহাত্মা কবীর আমাদের দর্শন দেন। আমরা আত্মজ্ঞানপ্রার্থী হলে কবীরসাহেব বললেন যে যথাসময়ে তোমাদের বাসনা পূর্ণ হবে। তারপর অল্পদিন মধ্যেই আমাদের মৃত্যু হয়। পরিবারের আপনজনেরা আমাদের গঙ্গায় বিসর্জন দিলেন। তারপর যাহা ঘটেছে আপনারাও জানেন।" শিশু কামাল এ-কথাও

বলল যে তার পূর্বজন্মের স্মৃতি জাগ্রত থাকার মূলে রয়েছে মহাত্মা কবীরের আশীর্বাদ।

এই ঘটনায় শেখ তকী অত্যন্ত লজ্জিত হলেন। পরবর্তী কালে এই শিশুটিই কবীরসাহেবের প্রধান শিষ্য রূপে খ্যাত হয়েছিলেন।

অনেকে কামালকে কবীরসাহেবের ঔরসজাত পুত্র বলে মনে করেন। এ-কথার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে তাঁরা 'শ্রীগুরু গ্রন্থসাহেব' থেকে নিম্নলিখিত পদটির উল্লেখ করেন—

বুড়া বংস কবীর কা, উপজ্যো পূত কামাল।
হরিকা সুমিরণ ছাঁড়িকে, ঘর লে আয়া মাল॥

কিন্তু সাধুসমাজে গুরুকে আধ্যাত্মিক পিতা বলে স্বীকার করা হয়, কাজেই শিষ্যকে পুত্রও বলা যায়। সম্ভবতঃ কবীরের শিষ্য কামাল পরবর্তীকালে গৃহস্থালী জুড়ে বোকামি করেছিল, আর সেই থেকেই উল্লিখিত প্রবচনটি চলে আসছে। এই দোহাটি পড়ে এ-কথাও মনে হয় যে কোনো তৃতীয় ব্যক্তি কবীর আর কামাল সম্বন্ধে কিছু বলছেন। এ-কথা অবশ্য আগেই বলা হয়েছে যে এই ধরণের রচনা পরবর্তী কালে কবীরসাহেবের নামে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই দোহাটিও সেই শ্রেণীর অন্তর্গত।

এই ধরণের গল্প 'কামালী' সম্বন্ধেও প্রচলিত আছে। একবার সুলতান সিকন্দর দরবারে বসেছেন এবং কবীরসাহেব নীতি-উপদেশ দিচ্ছেন—এমন সময় শেখ তকীও এসে উপস্থিত হলেন। অল্পদিন আগে তকীর মেয়ের মৃত্যু হয়েছে— সেজন্য তকী শোকগ্রস্ত ছিলেন। দরবারে পদার্পণ করেই তিনি

বলতে লাগলেন, "গঙ্গায় ভেসে যাওয়া সেই মৃত শিশুটিকে কবীরসাহেব বাঁচিয়েছিলেন— এই কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়, কারণ কখনও কখনও কোনো মানুষের প্রাণ মাথার খুলিতে ডুব মেরে থাকে, তাতেই দেহটাকে মৃত বলে মনে হয়। ঠিক এমন অবস্থা যখন কারও হয় তখন যথাযোগ্য যত্ন পরিচর্যা করলেই সে আবার সুস্থ হয়ে ওঠে। সে-কথা যাক্। আমি বলছিলাম কি আমার মেয়েটি মারা গেছে— এবং তাকে কবর দেওয়াও হয়েছে। এই মৃত কন্যাকে যদি কবীরসাহেব বাঁচিয়ে তুলতে পারেন তবে বুঝব যে হ্যাঁ, তিনি সত্যিসত্যি প্রাণ দান করার শক্তি রাখেন, শুধু তাই নয়, আমি চিরদিনের জন্য তাঁর গোলাম হয়ে থাকব।" কবীরসাহেব শেখ তকীর কথা সব শুনলেন। তাঁর মৃত কন্যার কবর খুঁড়ে দিতে বললেন। কবর খোঁড়া হল। মেয়েটির শব যখন দেখা গেল কবীরসাহেব একটু জোর গলাতেই বললেন, "ওগো, শেখ তকীর কন্যা, উঠে এসে তো মা।" এ-ভাবে তিনবার কবীর ডাকলেন, কিন্তু শবদেহে কোনো সাড়া জাগল না। যারা জমায়েত হয়েছিল কবীরের অলৌকিক শক্তি দেখার জন্য তারা নিরাশ হল এবং একটা মজা পেল, তারা কবীরসাহেবকে বুজরুগ বলে ঠাট্টা করতে লাগল। কবীরসাহেবও বোধহয় মজা দেখছিলেন। কে জানত যে তিনি আর মুহূর্তমধ্যেই দৃশ্যপট সম্পূর্ণ বদলে দিতে পারবেন! তিনি কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার যখন ডাকলেন, "ওঠো-তো মা কবীরের কন্যা।" তৎক্ষণাৎ কবরের শব সুস্থ মানুষের মতো উঠে ছুটে এসে কবীরসাহেবের পায়ে লুটিয়ে পড়ল। কবীর মেয়ের নাম রাখলেন 'কামালী'। এই 'কামালী' তার পর সমস্ত জীবন

কবীরকেই নিজের পিতা বলে জানত এবং ভক্তি করত। এই ঘটনায় শেখ তকীর হৃদয় পরিবর্তিত হল। স্বকৃত অপরাধ স্বীকার করে তিনি কবীরসাহেবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। কিন্তু কামালীকে তিনি নিজের কাছে নিতে পারলেন না। কামালী কিছুতেই কবীরের আশ্রয় ছেড়ে গেল না। বাকি জীবন সে মহাত্মা কবীরের সেবা-পরিচর্যার কাজে কাটিয়ে দিল।

কামাল-কামালীকে প্রাণসঞ্চারের এ-সমস্ত কাহিনী কবীর-পন্থী গ্রন্থেই শুধু পাওয়া যায় এমন নয়, গরীবদাস সাহেব প্রমুখ অন্যান্য সাধুগণও তাঁদের রচনায় কামাল-কামালীর উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অনন্তদাস তাঁর 'পরচঈ' গ্রন্থে কামাল-কামালীর কোনো কথাই বলেননি। এর কারণ হয়ত এই যে, এরা ধরমদাসের মতো অনেকে পরবর্তীকালে এই পটভূমিতে এসেছে। তবুও কবীরের পন্থা এরা স্বীকার করে বলে এদেরও কবীরসাহেবের শিষ্যতালিকায় ধরা হয়েছে। এ-কথা নিশ্চিত যে কামাল-কামালী কবীরসাহেবের পুত্রকন্যা নয়। তবুও যদি মনে করা হয় যে কবীরের সময়ে ওরা বর্তমান ছিল। তাহলে বলতে হয় যে ওরা ছিল কবীরের শিষ্য-শিষ্যারূপেই।

যাঁরা মনে করেন যে কামাল-কামালী কবীরের পুত্র-কন্যা। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে কবীরসাহেব বিবাহিত ছিলেন। তাঁরা বলেন যে 'লোঈ' নামে কোনো-এক স্ত্রীলোকের পাণিগ্রহণ করেছিলেন এবং এই 'লোঈ'ই কামাল-কামালীর জননী। কবীর এবং লোঈ পরস্পরে কিভাবে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হলেন সে সম্পর্কেও এক চমৎকার গল্প প্রচলিত আছে। গল্পটি এই—

তখন গঙ্গার ধারে নির্জনে অরণ্যচারী এক মহাপুরুষ ছিলেন। একদিন গঙ্গাস্নান করতে এসে তিনি দেখলেন যে কম্বলে জড়ানো এক শরীরী জীব গঙ্গার স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। মহাপুরুষের কি জানি ইচ্ছা হল—তিনি ঐ বস্তুটিকে ধরে নিয়ে এসে পারে তুলে কম্বল খুলে দেখলেন—একটি মেয়ে। নিজের কুটীরে মেয়েটিকে নিয়ে এসে তিনি লালনপালন করতে লাগলেন। 'লোঈ' মানে 'কম্বল'। 'লোঈ' দ্বারা জড়ানো ছিল বলে মেয়েটিকে তিনি 'লোঈ' বলেই ডাকতেন।

মেয়েটি ক্রমে বড় হয়ে উঠল। কবীরদাস একদিন ঘুরতে ঘুরতে ওখানে এসে উপস্থিত। কিছুক্ষণ পর আরও দু-চারজন সাধু ও অরণ্যচারী এলেন।

সেই মহাপুরুষ তখন কুটীরে ছিলেন না। কাজেই পালিতা কন্যা 'লোঈ' তখন অভ্যাগতদের আদর-আপ্যায়ন করল। নিজের কুটীরে তাঁদের সমাদরে নিয়ে এসে বসতে দিল এবং প্রত্যেকের জন্য এক পেয়ালা করে দুধ এনে রাখল সম্মুখে। কবীরদাস ছাড়া আর সকল সাধুরাই দুধ পান করলেন।

কবীরদাসকে দুধ পান না করার কারণ 'লোঈ' জিজ্ঞাসা করল। উত্তরে কবীর বললেন, "আমি শব্দাহারী— শুনতে পাচ্ছি আরও এক সাধুর পায়ের শব্দ— তিনিও এখানেই আসছেন।"

বিস্ময়ান্বিত হয়ে সবাই দেখেন যে কিছুক্ষণের মধ্যেই আর একজন সাধু এসে পৌছলেন। কবীরসাহেবের অলৌকিক শক্তি প্রত্যক্ষ করে 'লোঈ' তাঁর প্রতি আকৃষ্ট এবং মুগ্ধ হল। কবীর যখন ওখান থেকে ফিরে চললেন, তখন 'লোঈ'ও তাঁর সঙ্গী হওয়ার জন্য অনুমতি চাইল। কবীরসাহেব সম্মতি

দিলেন। পরবর্তীকালে এই সঙ্গিনীই তাঁর সহধর্মিণী হয়ে কবীরের সেবাপরিচর্যায় রত হয়েছিলেন—এ-কথাও জানা যায়।

আবার কোনো কোনো কবীরপন্থী গ্রন্থে বলা হয়েছে যে 'লোঈ' কবীরসাহেবের পত্নী ছিলেন না, তিনি ছিলেন কবীরের শিষ্যা। এ-কথার সমর্থনে তাঁরা বলেন যে, যখন অরণ্যচারী সেই মহাপুরুষের অন্তিম সময় উপস্থিত তখন তিনি পালিতা কন্যা 'লোঈ'কে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, "মাগো, এখন তোমার কাছ থেকে বিদায় নিলাম আমি, কিন্তু মাভৈঃ, তোমার সকল সমস্যার সমাধান করার জন্য একজন মহাত্মা শীঘ্রই তোমার কাছে আসছেন। যতদিন তাঁর দেখা না পাবে, ততদিন তুমি এ স্থান ত্যাগ করবে না।" বলেই মহাপুরুষ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

লোঈ একাকী সেই নির্জন গঙ্গাতীরে রইল। কোনো লোক এদিকে এলেই সে উৎসুক হয়ে উঠত ; নাম-ঠিকানা জানতে চাইত। এ ভাবে কিছুদিন কেটে গেল। তার অভিপ্রেত মহাপুরুষের দর্শন এখনও মিলল না।

তারপর একদিন দুই মহাত্মা তার কুটীরের কাছে এলেন। লোঈ তাঁদের যথাযোগ্য আদর-আপ্যায়ন করে দুজনকে দুই পেয়ালা দুধ পান করতে দিল। একজন দুধ পান করলেন, কিন্তু অন্যজন দুধ পান না করে বললেন যে আরও একজন সাধু এখানে আসছেন। 'লোঈ' কিছুটা অবাক হল, এবং তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। উত্তরে মহাত্মা বললেন, "কবীর"। লোঈ এবার তাঁর জাতি, গোত্র জানতে চাইলে মহাত্মা আবার বললেন, "কবীর।" 'লোঈ' তৃতীয়বারে তাঁর 'ধর্ম' কি সে কথা জানতে চাইলে তিনি একই উত্তর দিলেন, "কবীর।"

লোঈ এবার তাঁর লোকান্তরিত পালকপিতা অরণ্যচারী মহাপুরুষকে স্মরণ করল এবং উপস্থিত মহাত্মা কবীরের কাছে সানুনয় প্রার্থনা জানাল, "মহারাজ, আমাকে আপনার আশ্রয়ে নিয়ে চলুন।" কবীর তখন বাৎসল্যের সুরে লোঈকে বললেন, "যাবে আমার আশ্রমে! চলো, আমরা ভগবানের ভজনা করে দিন কাটাই!"

কিন্তু 'লোঈ' নামের মেয়েটিকে নিয়ে যে বিরাট এক গল্পের কাঠামো খাড়া করা হয়েছে তার মূলেই ভুল ধরা পড়েছে। কবীর তাঁর স্বরচিত পদে 'লোঈ' শব্দের ব্যবহার যে-অর্থে করেছেন পাঠকরা তা ধরতে না পেরে যার যেমন ইচ্ছে ভাষ্য করেছেন।

কবীরসাহেব অবশ্য তাঁর রচনায় "সুনী রে লোঈ" অথবা "সুনো নর লোঈ" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন,

কহত কবীর সুনহু রে লোঈ,
হম ন কিসীকে ন হমরা কোঈ।

অথবা

জেহি হিত কৈ রাখা সব লোঈ,
সো সয়ান বাঁচা নহিঁ কোঈ॥

অথবা

কহত কবীর সুনহু রে লোঈ।
ভরমি পরৌ জনি কোঈ॥

সংস্কৃতের 'লোক' শব্দটির কালক্রমে বিবর্তিত হয়ে 'লোয়' বা 'লোঈ' হয়েছে। হিন্দীতে প্রচলিত 'লোগ' শব্দটিও

'লোক' থেকেই এসেছে। কবীরের কালে যা ছিল "সুনো রে লোঈ" আজকাল তাই হয়েছে 'সুনো রে লোগো' অথবা 'শোনো জনগণ'। অথচ অজ্ঞ পাঠকেরা মনে করল যে 'লোঈ কোনো মহিলার নাম এবং কবীর উক্ত নামের মহিলাকে সম্বোধন করে কিছু বলেছেন। তারপর কোনো গঞ্জিকাসেবী 'লোঈ'কে জড়িয়ে মজাদার গল্প রচনা করেছেন। পরবর্তী-কালে কবীরপন্থীরা যখন দেখলেন এ-সমস্ত ব্যাপার অনর্থের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন তাঁরা 'লোঈ' বিষয়ক কাহিনীটির কিছু রদবদল করলেন; তাতে করে কবীরসাহেবের 'শিষ্যা' রূপে 'লোঈ'কে স্বীকার করা হল। কিন্তু অনন্তদাসের 'পরচঈ' বা প্রাচীন কোনো কবীর-জীবনীতে এর কোনো উল্লেখই নেই।

কবীরের মূল রচনা রূপে স্বীকৃত পদ বা দোহা প্রভৃতিতে ব্যবহৃত 'লোঈ' শব্দটিকে কোনো কারণেই কবীরের স্ত্রী অথবা অন্য কারও স্ত্রী বলে ভুল করা চলে না।

কেউ কেউ আবার মনে করেন যে 'লোঈ'-তো ছিলই, 'লোঈ' ছাড়াও কবীরের আর এক সহধর্মিণী ছিল— তার নাম ছিল 'ধনিয়াঁ'। এই ধনিয়াঁকে কখনও কখনও 'রামজনিয়াঁ'ও বলা হত। শিখদের 'শ্রীগুরু গ্রন্থসাহেবে' কবীরসাহেবের যে-সকল রচনা সংকলিত আছে—তাতে দুটি পদ এ-রকম—

প্রথম—

মেরী বহুরিয়া কো ধনিয়া নাউ।
লে রাখিও রামজনিআ নাউ॥

ইনূহ মুণ্ডিঅন মেরা ঘর ধুঁধরাবা।
বিটবহি রাম রমউআ লাবা॥
কহতু কবীর সুনহ মেরী মাঈ।
ইন মুণ্ডিঅন মেরী জাতি গঁবাই।

দ্বিতীয়—

পহিলী কুরূপি কুজাতি বুলখনী
সাহুরৈ পেঈঐ বুরী।
অব কী সযুপি সুজাতি কুলখনী
সহজে উদরি ধরী॥
ভলী সরী মুঈ মেরী পহিলী বরী।
জগু জগু জীবউ মেরী অব কী ধরী॥
কহু কবীর জব লহরী আঈ
বড়ী কা সুহাগ টরিও।
লহুরী সঙ্গি ভঈ অব মেরৈ
জেঠী অউরূ ধরিও॥

এখানে প্রথম পদের চারটি পঙ্‌ক্তি যে কবীর তাঁর মাকে সম্বোধন করে বলেছেন সে-কথা স্পষ্টই বোঝা যায়। তাতে তিনি উত্তেজিত হয়েই যেন বলেছেন, "আমার স্ত্রীর বেশ ভাল নাম ছিল 'ধনিয়া'। ন্যাড়া সাধু 'ধনিয়া'কে 'রামজনিয়া' বলে ডাকে। এ আমাদের ঘরসংসার তছনছ করে দিল।" ইত্যাদি। পরবর্তী তুই পঙ্‌ক্তিতে কবীর অন্য কথার উত্তর দিচ্ছেন। যদি এই পদটিকে কবীরের মূল রচনা বলে স্বীকার

করা হয় তাহলে তো মানতেই হয় যে কবীরসাহেব বিবাহিত ছিলেন। কিন্তু আমরা দেখেছি যে 'গুরুগ্রন্থসাহেবে'ও এমন বহু পদ আর দোহা কবীরের রচনা বলে মুদ্রিত হয়েছে যেগুলি মূলত কবীরের নয়। কারণ, কবীরসাহেব লেখাপড়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করতেন না; সেজন্য তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী সাজিয়ে গুছিয়ে কেউই লিপিবদ্ধ করেনি। কবীরের বাণীর এমন কোনো প্রামাণিক সংকলন পাওয়া যায় না, যেটি কবীরের জীবদ্দশায় লিখিত অথবা মুদ্রিত হয়েছিল। সেইজন্যই কবীরের রচনা বলে পরিচিত সকল পদ বা দোহাতেই কিছু কিছু প্রক্ষিপ্ত আছে। এ বিষয়ে একটি প্রবাদই প্রচলিত আছে যে—

> **"কুছ কুছ কহী কবীরদাস,**
> **ঔর কহী সব সন্তন।"**

কাজেই 'এটি কবীরের রচনা, আর ওটি সন্তদের বাণী' এ-ভাবে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা বড়ই কঠিন। কবীরের মূল রচনা অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমাকে অসংখ্য হাতে-লেখা পুঁথি এবং ছাপানো বই ঘাঁটতে হয়েছে। তবে, এ সমস্ত সূত্রে যে-সমস্ত পদ প্রামাণিক বলে মনে করেছি সেগুলি 'কবীর গ্রন্থাবলী' নাম দিয়ে ছাপিয়েছি। কিন্তু উল্লিখিত পদ দুটি আমার দৃষ্টি-গোচর হয়নি বলে উক্ত গ্রন্থাবলীতে মুদ্রিতও হয়নি; সে-জন্যই আমার ধারণা, এই দুটি পদ পরবর্তীকালে কেউ-না কেউ কবীরের বলে চালিয়ে দিয়েছেন।

দ্বিতীয় পদে কবীর সুবুদ্ধি আর কুবুদ্ধি সম্বন্ধে একটি রূপক রচনা করেছেন। কখনও কখনও তিনি রঙ্গব্যঙ্গের আড়ালে পরমতত্ত্বের কথা বলতেন। এই ধরণের পদে মূল বক্তব্যের

অন্তরালে বাঁকা কথাও লুকানো থাকত; সেজন্য অনেকে আসল কথাটি বুঝতে না পেরে ভুল করে ভুল বুঝত। তাঁর নামে আরও একটি দোহা প্রচলিত আছে যেজন্য লোকে বলে থাকে যে নিজের বিবাহ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন। দোহাটি এই—

নারী তো হম ভী করী, বুঝা নহীঁ বিচার।
জব জানী তব পরহরী, নারী বড়া বিকার॥

কিন্তু এই দোহা কবীরের মূল বাণীর মধ্যে নেই। তাই বলতে হয় এটি পরবর্তীকালের প্রক্ষেপ। কবীরের মূলবাণী পরিচিত নিম্নলিখিত পদটির উল্লেখ করা বিশেষ আবশ্যক বলে মনে করি। তাতে তিনি বলেছেন,

মুসি মুসি রোবৈ কবীরকো মাই।
যহ বারিক কৈসৈ জীব হি খুদাই।
কহৈ কবীর সুনহু মেরী মাঈ।
পূরনহারা ত্রিভুবনরাঈ॥

'যহ বারিক কৈ সৈ জীবহি খুদাই' (এই বালক কেমন করে বাঁচবে, হে খোদা!) বলার কারণ এমন হতে পারে যে কবীরের কোনো শিশু সন্তান ছিল, যার কথা ভেবে তাঁর মা চিন্তিত হয়ে দুঃখ করে বলছেন, "হায় খোদা, এই বালক কেমন করে বাঁচবে?" কারণ কবীর সংসার বাসনা ছেড়ে দিয়ে ভক্তি-পথ আশ্রয় করেছেন। কিন্তু আসলে কবীরের মা কবীরের কথা ভেবেই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। কবীর তখন অবশ্য বালক ছিলেন না কিন্তু মায়ের কাছে ছেলের বয়স তো কোনো

দিনই বাড়ে না। বুড়ো ছেলেকেও তার মা শিশুর মতোই অসহায় মনে করেন।

এ-সমস্ত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে কবীর অবশ্যই সংসার-যাত্রা নির্বাহ করতেন ; কিন্তু এমন কোনো সুনির্দিষ্ট লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায় না যার ওপর নির্ভর করে বলা চলে যে তিনি বিবাহিত ছিলেন এবং তাঁর সন্তান-সন্ততি ছিল।

একদিকে একদল লোক বলছে যে কবীর বিবাহিত ছিলেন, অন্য দিকে তাঁর ভক্তরা বলেন যে তিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ছিলেন। ভক্তদের মধ্যে এ সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। গল্পটি এই—

একবার ভগবান স্বয়ং কবীরকে পরীক্ষা করার জন্য স্বর্গের এক অপ্সরাকে ডেকে বললেন,

"বারাণসীতে কবীরদাস নামে আমার এক ভক্ত আছে। তুমি আজই তাঁর কাছে সোজা চলে যাও, এবং তোমার মোহিনী মায়া দিয়ে তাঁকে সম্মোহিত করো।"

ভগবানের আদেশ পেয়ে অপ্সরা তো ষোড়শ শৃঙ্গার করে এমন মায়াবিনী রূপ ধারণ করল যে মনে হল স্বয়ং রম্ভা চলেছেন শুকদেবকে সম্মোহিত করতে। তার মুখের বুলিতে অমৃত ঝরে, তার রূপে ব্রহ্মার তপস্যা ভেঙে যায়, মানুষ তো কোন্ ছার! অপ্সরীর চলন তো নয়, যেন নৃত্য। তার দৃষ্টি যার ওপর পড়ে সেই কামবাণে বিদ্ধ হয়।

কবীরের কাছে উপস্থিত হয়ে অপ্সরা বলল, "খানিক নিরীক্ষণ করো আমার রূপ। চোখ নামিয়ে নিয়ো না বলছি। এই রূপসুধা পান করার জন্য কে না পাগল হয়। কত যোগী হিমালয়ে তপস্যা করছে আমার জন্য, কত পুণ্যবান কাশীবাসে

কৃচ্ছ্রব্রত সাধন করছে, তাতেও তারা আমাকে পায় না। সেই দুর্লভ বস্তু তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে। তুমি আমাকে উপভোগ করো, তা না হলে তোমার জপ-তপ সমস্তই ব্যর্থ হবে।"

কবীর অটল অচল। শান্ত সংযত ভাষায় তিনি বললেন, "শোনো মা, স্বর্গলোকে তোমার এমন কি অসুবিধা ঘটল যে তুমি এই অভাজনের কাছে এসে হাজির হলে? তুমি কি জানো না যে আমি জোলার ছেলে, তুচ্ছ আমার পেশা; এই অভাগার কাছে কেন এসেছ মা? তোমার উপযুক্ত স্থান রাজার প্রসাদ—চন্দন কস্তুরীর সুগন্ধে ভরপূর হয়ে সেখানে অপেক্ষা করছেন রাজপুত্রগণ! আমি তো জড় প্রস্তরবিশেষ। সুখ ভোগ আমোদ-প্রমোদের কোনো অনুভূতি আমার নেই। অযথা আমার কাছে বসে বসে তুমি তো লজ্জায় মরে যাবে মা! তোমার দৃষ্টি আমার কাছে বিষবৎ। আমার হৃদয়ে হরি বসে আছেন, এখানে তোমার ঠাঁই হবে না। তাই বলি মা, তুমি আমাকে রেহাই দাও। আমাকে দিয়ে তোমার কোনো আশা নেই। যেখান থেকে এসেছ সেখানে ফিরে যাও। স্বর্গ কি অরণ্যে পরিণত হল যে তুমি এই অধমের কাছে ছুটে এসেছ।"

অপ্সরার সকল ছলনাই যখন ব্যর্থ হল তখন সে স্বর্গলোকে ফিরে গেল এবং ভগবানের কাছে সকল ঘটনার উল্লেখ করে বলল, "পশ্চিম দিকে সূর্যোদয় সম্ভব হলেও কবীরের মন ভুলানো কঠিন। মায়ামোহ থেকে উদাসীন এমন মনুষ্য জগতে দুর্লভ।"

অপ্সরার কথা শুনে ভগবান কবীরের ওপর তুষ্ট হলেন এবং স্বয়ং এসে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। ভগবানকে

দেখে কবীরের নয়ন তৃপ্ত হল। ভগবান বললেন, "তুমি যা চাইবে, তাই আমি তোমাকে দেব— কি তোমার প্রার্থনা আছে, বলো : অষ্টসিদ্ধি নবরত্ন চাও তুমি! যদি বলো তো এই মুহূর্তে তোমাকে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর করে দিতে পারি।"

উত্তরে কবীর বললেন, হে ত্রিভুবনেশ্বর, আমি এ-সব কিছুই চাইনে। আমি তো বিহ্বল অবস্থায় আছি, ভালোমন্দ কিছুই জানিনে। পিপীলিকা কি পর্বত উত্তোলন করতে পারে? তারকা কি চন্দ্রকে আবৃত করে? অঞ্জলি দ্বারা কি সমুদ্র সিঞ্চন সম্ভব? যে বালক মধু আর বিষের তারতম্য বুঝতে পারে না— আমি তো তেমনই এক অপোগণ্ড শিশু মাত্র।"

কবীরের বিনয়ে ভগবান বড়ই তৃপ্ত হলেন। ভক্তের মাথায় হাত রেখে তাঁকে অজয় অমর বর দিয়ে তিনি বৈকুণ্ঠে চলে গেলেন। স্থিতপ্রজ্ঞ কবীর! তুমি ধন্য!

এরপর আর কি বলার আছে! প্রত্যেক ভক্তের জীবনেই এই ধরণের কাহিনী জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ঐশ্বরিক বিভূতির প্রতিই যে-মানুষ এমন উদাসীন, জাগতিক ভোগসুখের প্রলোভন তো তাঁর কাছে ঘেঁষতেই পারে না— এই কথাটি বলার জন্যই এ-সমস্ত গল্পের অবতারণা।

কবীর তাঁর ধর্মমতের প্রচার অবশ্য করেছিলেন—তবে ইএ প্রচারের সঙ্গে নিজের নাম তিনি জড়িয়েছিলেন বলে মনে হয় না। এখন তো কবীরপন্থী বহু সম্প্রদায় দেশের নানাস্থানে প্রতিষ্ঠিত। এদের আবার স্ব স্ব শাখাও বর্তমান। এই-সমস্ত শাখা যাঁরা প্রবর্তন করেছেন মনে হয় তাঁরাও কবীরের একান্ত

অনুগত ছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভক্ত ধর্মদাসের কথা বলা যায়। এই ধর্মদাস কবীরপন্থী ছত্রিশগড়ী শাখার প্রবর্তক। কবীর-পন্থীদের বিশ্বাস এই যে কবীর তাঁর দেহত্যাগের পর বান্ধব-গড়ে পুনরায় আবির্ভূত হলে পর ধর্মদাসকে উপদেশ দেন এবং ধর্মপ্রচারের আদেশ করেন।

এ থেকে এ কথাটি স্পষ্ট হয় যে কবীরের দেহত্যাগের পরই ধর্মদাস তাঁর ধর্মমত প্রচার করেছেন। এই ধর্মমতও 'কবীরপন্থ' নামে পরিচিত। তা ছাড়া বিহার রাজ্যের সারন জেলায় ধনৌতী নামক স্থানে যে কবীরপন্থী মঠ আছে সেটির পরিচালকরূপে ভগবানদাসের নাম শোনা যায়। তাঁর সম্বন্ধে জনশ্রুতি এই যে তিনি সর্বদাই কবীরের সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন এবং তাঁর ভজনাদি টুকে রাখতেন। নিজের ব্যবহারের জন্য এইভাবে লিখে রাখা প্রায় ছয় শত কবীর-বাণীর একটি ছোটো বই তিনি সংকলন করেন। এই সংকলনটি পরে 'বীজক' নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু এই 'বীজক'ও কবীরের জীবদ্দশায় প্রচলিত হয়েছিল কিনা, সে কথা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। কাশীর কবীরচৌরা মঠের সর্বপ্রথম মোহন্ত সুরতগোপালের সম্বন্ধেও এ-রকম কথা শোনা যায়। আবার কামাল সাহেবের বিষয়ে বলা হয়েছে যে লোকের মুখের বহু কথা শুনেও তিনি কবীরের নামে অথবা তাঁর নিজের নামে কোনো ধর্মমত প্রচারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি; কারণ মহাত্মা কবীর ধর্ম বা সম্প্রদায় প্রবর্তনের নিন্দাই করতেন। তিনি প্রত্যেক মানুষকে নিজের শ্রমের অন্নে সাদাসিধেভাবে জীবনযাপনের ওপরই জোর দিয়েছেন। এজন্য কামালকেই তাঁর সবচেয়ে পুরনো শিষ্য বলে মেনে নিতে হয়। পুরনো বলেই তাঁর সম্বন্ধে আমরা প্রায়

কিছুই জানিনে। কামালীর সম্বন্ধেও তো আগেই বলা হয়েছে। এদের বাদ দিলে কবীরের শিষ্যরূপে আর যাঁদের নাম জানা যায় তাঁরা হলেন পদ্মনাভ, তত্ত্বা, জীবা, জ্ঞানী, জাগুদাস ও রামকৃপাল। যদিও বলা হয়েছে যে এঁরা কবীরের উপদেশানুবর্তী ছিলেন, তবু এ-কথা মনে করা যায় না যে এঁরা তাঁর জীবদ্দশায় বর্তমান ছিলেন।

কবীরের সম্বন্ধে একটি প্রসিদ্ধি এই যে তিনি লেখাপড়া একেবারেই করেননি। বীজকের একটি সাখীই তার প্রমাণ। যথা—

মসী কাগদ ছুয়ো নহীঁ, কলম গহী নহিঁ হাথ।
চারিউ জুগন মহাত্ম কবীর, মুখহিঁ জনাঈ বাত॥

কোনো পাঠশালাতেও নিয়মিতভাবে তাঁর পড়াশোনা হয়নি। এ-কথা মেনে নিলেও স্বীকার করতে হয় যে কবীর নিরক্ষর মূর্খ ছিলেন না। তিনি সাক্ষর ছিলেন। তা ছাড়া ছিল তাঁর পূর্বজন্মের সংস্কার। এই সংস্কার আর স্বভাবজাত সৎপ্রবৃত্তির দৌলতে তিনি ধর্মসাধনার নিগূঢ়তত্ত্ব অবগত ছিলেন। বেদ, উপনিষদ, গীতা, ভাগবত সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা তাঁর ছিল। গোরখনাথ ও সিদ্ধদের প্রবর্তিত সাধনতত্ত্বের প্রভূত পরীক্ষা-নিরীক্ষা তিনি করেছেন। এই ধর্মমতের প্রতিটি সূক্ষ্মতত্ত্বের খবর তিনি রাখতেন। আবার, একদিকে যেমন শৈব, শাক্ত, জৈন মতের মূল তত্ত্বগুলি তিনি মানতেন, অন্য দিকে মুসলমান ধর্মমতের খুঁটিনাটি সম্বন্ধেও তিনি মোটেই অজ্ঞ ছিলেন না। তাঁর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, নিজে যাচাই না করে অন্ধের মতো তিনি কোনো কিছুরই অনুসরণ

করতেন না। প্রতিটি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার এবং তা থেকে উদ্ভূত জট জটিলতা দূর করার অদ্ভুত কৌশল তাঁর জানা ছিল—যেটি ছিল তাঁর একান্তই নিজস্ব। তাঁর প্রতিভাও প্রখর ছিল। বিচার-বিবেচনার নিকষপাথরে নিজের নির্গুণভক্তির যে নূতন পথ তিনি রচনা করেছিলেন তার মূলে ছিল তাঁর প্রতিভা। তাঁর আবিষ্কৃত পথে প্রেম আর বিরহের স্থানই সর্বোচ্চ। বাহ্যিক আড়ম্বরের নিন্দা করে তিনি মনের পরিবর্তন সাধনের ওপর জোর দিয়েছেন। (যোগশাস্ত্রে এই নূতন সাধনপ্রণালীর নাম দেওয়া হয়েছে 'সুরতিযোগ') লোকাচারের অন্ধ তামসিকতা বর্জন করে সহজভাবে জীবনযাপন করাই হল এই যোগের মূল কথা।

কবীরের বাণীতেই তাঁর ধর্মমতের কথা বলা আছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর রচনা নিয়ে এক দুর্বোধ্য গোলকধাঁধার সৃষ্টি হয়েছে। এই ধাঁধার বেড়াজাল থেকে তাঁর মূল রচনার খোঁজ পাওয়া সহজ নয়। এই সমস্যার মূলে রয়েছে পুঁথিপত্রে কবীরের অবিশ্বাস। যেজন্য তিনি নিজে তো নিজের রচনা সাজিয়ে গুছিয়ে লিখে রাখার কথা চিন্তা করেনই নি, উপরন্তু, তাঁর জ্ঞাতসারে কেউ এমন কাজ করবে—তেমন দুঃসাহস কারও ছিল না। আগেই বলা হয়েছে ভগবানসাহেব সম্বন্ধে প্রসিদ্ধি আছে যে তিনি কবীরের বাণীর একটি ক্ষুদ্রাকার সংকলন করেছিলেন; সেটি পরে 'বীজক' নামে পরিচিত হয়েছে। এই বীজককে যতটা প্রাচীন বলে মনে করা হয়, ততটা প্রাচীনতা এর নেই। তবে, কবীরের রচনাবলীর মধ্যে বীজকই প্রথম ছাপাখানায় গিয়েছিল বলে জানা যায়। বীজক এ পর্যন্ত কম করেও ত্রিশ-চল্লিশ জায়গা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। কে জানে বীজকের কতগুলো সংস্করণ বাজারে বিক্রী

হয়েছে। বীজকের বহুল প্রচারের কারণ এই যে কবীরপন্থীরা বীজককে নিজেদের ধর্মগ্রন্থরূপই মেনে থাকেন। তাঁরা এও বিশ্বাস করেন যে সকল প্রকার প্রক্ষিপ্ত বর্জন করে কেবল কবীরের মূল রচনাই বীজকে সংরক্ষিত হয়েছে। কিন্তু, কবীরের রচনা বলে প্রচলিত কোনো সংকলনকেই প্রকৃতপক্ষে প্রামাণিক মনে করে চলে না। কারণ, কবীরের জীবদ্দশায় এবং তাঁর প্রয়াণের পরে যে-সকল গ্রন্থে তাঁর বাণী সংকলিত হয়েছিল— তার একটিও এখন কোথাও পাওয়া যায় না। এর ফলে কবীরের বাণী-সংবলিত যে-সকল গ্রন্থ এখন প্রচলিত আছে তার কোনোটির সঙ্গে কোনোটির মিল নেই। এ-সকল গ্রন্থের পরস্পরের বিষয়বিন্যাস, পাঠ, এবং পদের সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন।

প্রসঙ্গক্রমে 'শ্রীগুরুগ্রন্থসাহেব'-এর কথাও আসে। শিখদের পঞ্চমগুরু শ্রীঅর্জুনদেব ১৬৬১ বিক্রমসংবতে এটি সংকলন করেন। সন্তসাহিত্যের এক মহামূল্যবান সংগ্রহ এই গ্রন্থ। এতে শিখগুরুদের বাণী ছাড়াও অন্য সন্তদের বাণী সংকলিত আছে। কবীরেরও প্রায় সোওয়া দু'শ পদ, আড়াইশ শ্লোক, অথবা দোহা এর মধ্যে রয়েছে। শিখেরা 'গ্রন্থসাহেব'কে তাঁদের গুরুর আত্মার আবাস বলে মানেন। এই কারণে এই গ্রন্থের প্রতিলিপি প্রস্তুত বা পুনর্মুদ্রণকালে কোনোরূপ পরিবর্তন করা চলে না। এমনকি, একটি মাত্রাও এদিক ওদিক হবার জো নেই। ফলে, প্রথম থেকে আজও পর্যন্ত গ্রন্থসাহেবের পাঠ অপরিবর্তিতই আছে ; এই গ্রন্থটি প্রথমাবধি যথাসম্ভব সুরক্ষিত আছে বলেই স্বীকার করা হয়। কিন্তু যে-সকল বই থেকে কবীরের বাণী গ্রন্থসাহেবে সংকলিত হয়েছে সে-সকল বই কবীরের মূল বাণীগুলি বাছাই করে ছাপতে পারেনি বলে

গ্রন্থসাহেবের মধ্যেও সে-সমস্ত বইয়ের গোঁজামিল ঢুকে পড়েছে। কাজেই গ্রন্থসাহেবে সংকলিত সকল কবীর-বাণীকে নির্বিচারে মূল বাণী বলে গ্রহণ করা চলে না। একইভাবে ভিন্ন পন্থীদের ধর্মগ্রন্থেও কবীরের বাণীর সংকলন দেখতে পাওয়া যায়; কারণ সন্তদের সকল সম্প্রদায়েই কবীর অধিকতর মান্য ছিলেন। এই ধরণের সংকলনের মধ্যে একটির উল্লেখ এখানে করা আবশ্যক বলে মনে করি। এই সংকলনটির নাম 'পঞ্চবাণী'। দাদূ-পন্থী পাঁচজন মহাপুরুষের বাণী এই সংকলনে গৃহীত হয়েছে। এই পাঁচজনের নাম দাদূ, কবীর, নামদেব, রৈদাস ও হরদাস। রাজস্থানে আজকাল দাদূপন্থের খুব প্রচার হচ্ছে। আগেতো সেখানে দাদূর প্রভাব আরও বেশি ছিল। যাহোক, পাঁচ-মহাপুরুষের বাণীর যেখানে মিলন ঘটেছে সেই 'পঞ্চবাণী'তে কবীরের চারশ'রও বেশি পদ, আটশ'র মতো সাখী বা দোহা এবং কিছু রমৈণী বা চৌপদী সংকলিত আছে। কাশীর নাগরী প্রচারিণী সভা এই ধরণের একটি সংকলন 'কবীরগ্রন্থাবলী' নাম দিয়ে প্রকাশ করেছেন। এ ছাড়া বরোদা রাজ্যের সীমা-বাগের কবীর প্রেস, বোম্বাইয়ের বৈকুণ্ঠেশ্বর প্রেস এবং এ-রকম আরও কয়েকটি প্রেস থেকেও কবীরের সাখীগুলি প্রকাশিত হয়েছে। শান্তিনিকেতনের আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ও সারা ভারতে ঘুরে ঘুরে সন্তদের মুখনিঃসৃত বাণী সংগ্রহ করেছেন, এবং সে-সমস্ত বাণী তিনি চারটি ভাগে গ্রন্থাকারে ছাপিয়েছেন। এরই ইংরেজি অনুবাদ কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুপ্রেরণায় মুদ্রিত হয়েছে। এতে করে কবীরের প্রচার পাশ্চাত্ত্যদেশে বেড়েছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনে কবীরের বাণীর প্রভাব ছিল অপরিসীম।

তথাপি, যেমন আগেই বলেছি, এই-সমস্ত সংকলনের একটির সঙ্গে অন্যটির অমিলই বেশি, মনে তেমনই স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে এই মহাপুরুষের মূল রচনার সংখ্যা কত এবং সেগুলির মূল রূপই বা কি? কারণ কেবল কবীরের কীর্তি-কলাপকে আশ্রয় করেই তো আমরা তাঁর মহত্ত্বের স্বরূপ নির্ণয় করতে পারি। মনে এই পরিকল্পনা রেখেই আমি কবীর-সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করি। বহু হাতে লেখা পুঁথি এবং মুদ্রিত গ্রন্থ ঘেঁটে আমি সংগ্রহ করেছি কবীরের প্রায় ষোলোশ' পদ সাড়ে চার হাজার সাখী, এবং একশ চৌত্রিশটি রমৈনী। এবার মনে প্রশ্ন জাগল— সংগৃহীত এ-সমস্তই কি কবীরের মূল রচনা? কবীরপন্থীদের তো ধারণা এই যে সদ্‌গুরুর বাণীর সীমা সংখ্যা নেই; তাঁর বাণী অসংখ্য অনন্ত। তাঁরা বলেন গাছের যত পাতা, গঙ্গায় যত বালুকণা সদ্‌গুরু কবীরের বাণীর সংখ্যাও তত।

জেতে পত্র বনসপতি, ও গঙ্গা কী রৈন।
পণ্ডিত বিচারা ক্যা কহৈ, কবীর কহী মুখ বৈন॥

কবীরের মুখ থেকে শব্দ যে অসংখ্য বেরিয়েছে তাতে তো সন্দেহ নেই; কিন্তু প্রথম যে পুঁথিতে তাঁর মুখনিঃসৃত শব্দাবলী ধরে রাখা হয়েছিল, সেই পুঁথিটি কোথায়? যতটা পারা যায় এ বিষয়ে সকল সম্ভাব্য স্থলেই জিজ্ঞাসাবাদ করেছি; ফলে একটা মোটামুটি ধারণা আমার হয়েছে। এর উপর ভিত্তি করেই আমি এ কাজে হাত দিয়েছি। এবং এ পর্য্যন্ত কবীরের প্রায় দু'শ পদ, কুড়িটি রমৈনী, একটি চৌত্রিশপদী রমৈনী এবং সাড়ে সাত সাখী এমন পেয়েছি, যেগুলিকে সর্বসম্মতিক্রমে

কবীরের মূল রচনা বলে মেনে নেওয়া চলে। এই রচনাগুলি 'কবীরগ্রন্থাবলী' নামে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দী পরিষদ্ প্রকাশ করেছেন। তবে, এ-কথা নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারে না যে 'কবীরগ্রন্থাবলী'তে মুদ্রিত বাণীগুলিই হুবহু কবীরের মুখ থেকে বেরিয়েছিল। তথাপি অন্ততঃ এ-কথা জোর দিয়ে বলা চলে যে কবীরের বাণী বলে যত সংকলন আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে উক্ত 'কবীরগ্রন্থাবলী' সবচেয়ে প্রামাণিক; অবশ্য এ বিষয়েও অল্পবিস্তর মতভেদ আছে, যা চিরকালই থাকবে।

কবীরপন্থীরা বলেন যে কবীর বহু লোককে তর্কে পরাজিত করেছেন এবং পরাজিত সকলেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। অনুগতদের তিনি মাঝে মাঝে উপদেশ দিয়েছেন। শাস্ত্র-বিষয়ক এ-সমস্ত উপদেশ 'গোষ্ঠীগ্রন্থ' এবং 'বোধগ্রন্থ' নামে সংকলিত হয়েছে। গোষ্ঠীগ্রন্থের কয়েকটি নাম হল কবীর-গোরখ গোষ্ঠী, কবীর-শংকরাচার্য গোষ্ঠী, কবীর-দত্তাত্রেয় গোষ্ঠী, কবীর-দেবদূত গোষ্ঠী, কবীর-জোগাজীত গোষ্ঠী, কবীর-সর্বাজীত গোষ্ঠী, কবীর-হনুমান গোষ্ঠী, কবীর-বশিষ্ঠ গোষ্ঠী এবং কবীর-রৈদাস গোষ্ঠী। আবার বোধগ্রন্থের মধ্যে আছে মুহম্মদবোধ সুলতানবোধ, গরুড়বোধ, অমরসিংহবোধ, বীরসিংহবোধ, জগজীবনবোধ, ভূপালবোধ, কমালবোধ, জ্ঞান প্রকাশ বা ধর্মদাসবোধ প্রভৃতি। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দেশ-কালের সীমা অতিক্রম করে এমন দুই ব্যক্তির মধ্যে কথোপকথন করানো হয়েছে যাঁদের নিজ নিজ সময়ের ব্যবধান শত শত বৎসর। তবুও কবীরপন্থীরা এগুলিকেও কবীরের রচনা বলেই মনে করেন। শুধু কি তাই, তাঁদের বিশ্বাস, কবীরসাহেব

যখনই প্রয়োজন হবে তখনই সশরীরে আবির্ভূত হবেন। কিন্তু উল্লিখিত গ্রন্থগুলি পড়ে দেখলে এ-কথা বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না যে যখন সবেমাত্র কবীরপন্থ প্রতিষ্ঠা লাভ করছে এবং ভিন্নপন্থীদের সঙ্গে তাঁদের মতভেদ দেখা দিয়েছে তখনই এই গ্রন্থগুলি রচিত হয়েছে। এগুলিতে কল্পনার দৌড় দেখার মতো। দৃষ্টান্ত স্বরূপ গোরখ-গোষ্ঠীতে লিখিত একটি কাহিনীর উল্লেখ এখানে করা যাক। কাহিনীটি এই—

গোরখবাবা শাস্ত্র নিয়ে কথাবার্তা বলার জন্য একবার কবীরের কাছে এলেন। এসেই তিনি তাঁর ত্রিশূলখানি মাটিতে পুঁতলেন। নিজে ত্রিশূলের একটি ফলার ওপর বসলেন এবং অন্য একটি ফলাতে কবীরকে বসতে বললেন। কবীর তখন তাঁর মাকু থেকে সুতো বের করে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিলেন। তারপর সেই সুতোর প্রান্তে বসে উপর থেকে বললেন, "নাথজী, ত্রিশূল তো মাটিতে পোঁতা। আসুন সেখান থেকে উঠে, এই সুতোর ওপর এসে বসুন— আর কথাবার্তা শুরু করুন। নিরলম্ব হয়ে এই সুতো অনন্ত আকাশে ঠেকে আছে— এর চেয়ে ভালো জায়গা পৃথিবীতে পাবেন কোথায়?"

'গোরখগোষ্ঠী' থেকে অন্য একটি কাহিনী এখানে উদ্ধৃত করছি—

গোরখনাথের প্রশ্ন :

সিব্ধা কৌনে দীনঁা ডণ্ড কমণ্ডল, কিন দীনীঁ মৃগছালা।
কৌনে তুমকো হরিনাম সুনায়া, কিন দীনীঁ জপমালা॥

কবীরের উত্তর :

ব্রহ্মা দীনী ডণ্ড কমণ্ডল, শিব দীনীঁ মৃগছালা।
গুরু হমারে হরিনাম সুনায়া, বিষ্ণু দীনীঁ জপমালা ॥

গোরখনাথের প্রশ্ন :

অণ্ডান মণ্ডান, চারি খুরী দোকান।
জানৈ তো জান নহীঁ ঝোলী মালা আগে আন ॥

কবীরের উত্তর ঃ

অণ্ডান ধরতী মণ্ডান আকাশ।
চারি খুঁট চারি খুরী চন্দ সূর দো কান ॥
নহীঁ আনোঁ ঝোলী নহীঁ আনৌ মালা।
মোহীঁ গুরু রামানন্দ কী আন ॥
সীঙ্গী ঝোলী ঔর চরপটী।
ফির বোলৈ তো মারোঁ কনপটী ॥

গোরখবাবা নিজের কান সামলে নিয়ে চম্পট দিলেন।

এ থেকেই প্রতীয়মান হয় যে এ-সমস্ত গ্রন্থ কবীরের নয়। বরং এগুলিকে পরবর্তীকালের কবীরপন্থীদের গ্রন্থ বলা যায়। আবার যে-রচনাকে গোরখনাথের বলা হয়েছে, তাও তাঁর অনুগামীদেরই প্রয়োজনে রচিত বলা যায়।

কবীর তো বলেছেন, "জো পহিরা সো ফাটিসী, কম ধরাসো জাই।" যে-কাপড় নিত্যদিন পরা হয় তা একদিন না একদিন ছিঁড়বেই। ঠিক এ-রকম আত্মা যে দেহরূপী বস্ত্রে আবৃত হয়, সময় হলে সেও পঞ্চতত্ত্বে বিলীন হবে। কবীরের

দেহাবসানের দিন যখন কাছে এল তিনি কোনো কারণবশতঃ কাশীধাম ত্যাগ করে মগহর নামক গ্রামে চলে গেলেন। এই গ্রাম এখন বস্তিজেলার অন্তর্গত। অন্তিম সময়ে কবীর কেন মগহরে গেলেন তা নিয়ে নানা গল্প প্রচলিত আছে। কেউ কেউ বলেন হিন্দুদের মধ্যে একটি সংস্কার আছে যে মগহরে মরলে মানুষ মুক্তি পায় না : 'মগহরে মরলে গাধা হয়'। পুরাণে আছে যে দক্ষরাজা মগহরে এক মহাযজ্ঞ করেছিলেন, কিন্তু এই যজ্ঞে শিব আমন্ত্রিত হননি। দক্ষকন্যা সতী তো শিবের পত্নী। শিবের অপমান সতীর গায়েও লাগল। অভিমানে তিনি দেহত্যাগ করলেন। পত্নীবিয়োগে বেদনাহত শিব উন্মত্ত হয়ে দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করলেন এবং এই অভিশাপ দিলেন যে শিবের প্রতি ভক্তি না নিয়ে যে-কেউ এখানে দেহত্যাগ করবে তার বিষ্ণুপদ প্রাপ্তি অর্থাৎ সদ্‌গতি হবে না। শুধু তাই নয়, পরজন্মে সেই অবিশ্বাসী গাধা হয়ে জন্ম নেবে। কুসংস্কার দূরীকরণে কবীর ছিলেন আজন্ম বিদ্রোহী। মগহরের অপবাদ দূর করার জন্যই তিনি তাঁর অন্তিম সময়ে সকলের চিরবাঞ্ছিত কাশীধাম ত্যাগ করে বিভীষিকারূপী মগহরে চলে এলেন। কবীরপন্থীদের গ্রন্থে আছে যে কবীরের মগহর-যাত্রার সংকল্পের কথা যখন চার দিকে ছড়িয়ে পড়ল তখন দেশের রাজা-বাদ্‌শা থেকে শুরু করে ফকির ভিখিরি পর্যন্ত সকলে দল বেঁধে মগহরের দিকে রওয়ানা হলেন ; কবীরভক্তদের তো কথাই নেই। কাশীর রাজা বীরসিংহদেব, বঘেলা, রেওয়ার রাজা রামসিংহ এবং অযোধ্যার নবাব মহমুদ্দৌলা প্রভৃতি মিলিতভাবে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন যে কবীরসাহেব যেন তাঁদেরও তাঁর সঙ্গে যেতে অনুমতি দেন। কবীর সে প্রার্থনা

মঞ্জুর করেছিলেন। সকলে যখন কাশী ছেড়ে কবীরের সঙ্গে সঙ্গে মগহরে এসে পৌঁছলেন তখন এক প্রকাণ্ড মেলা বসে গেল সেখানে। এদিকে কাশীধাম হল যেমন জনহীন তেমনই অন্ধকার ; কারণ মহাত্মা কবীর আর এখানে নেই।

মগহরের নবাব বিজলী খাঁ পাঠান অভ্যাগতদের ভোজনের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু এত লোক ওখানে ভিড় করেছিল যে সকলের পানীয় জল ছিল না। শোনা যায় ওই অঞ্চলের নদী পর্যন্ত শিবের অভিশাপে শুকিয়ে গিয়েছিল। দিব্যশক্তি প্রয়োগ করে কবীর ওই নদী জলে পূর্ণ করে দিলেন। এই শীতল জল অমৃতের মতো মধুর বলে নদীর নাম রাখা হল 'আমী'। আমী-র জল পান করে সকলে পরিতৃপ্ত হন। তারপর কবীর তাঁর কাছে সমবেত জনতাকে তাঁর শেষ উপদেশ দান করে নিকটবর্তী একটি কুটীরে ঢুকলেন এবং দরজা বন্ধ করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই 'ধড়াক্' করে একটা শব্দ হল এবং সঙ্গে সঙ্গেই একটা জ্যোতি কুটীর থেকে বেরিয়ে আকাশের দিকে চলে গেল। সকলে বুঝতে পারল যে মহাপুরুষের মহাপ্রয়াণ হল। সবাই তখন সমস্বরে কবীর-সাহেবের জয়ধ্বনি করল।

কিন্তু তার পরেই একটা কলহের সূত্রপাত হল। কাশীর রাজা বীরসিংহদেব এবং অন্য সব হিন্দুভক্তেরা বললেন যে কবীর হিন্দুদের গুরু ছিলেন, কাজেই তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হিন্দুমতে দাহ করা হবে। আবার নবাব বিজলী খাঁ এবং তাঁর মুসলমান সঙ্গীসাথীরা বললেন যে কবীর তাঁদেরও পীর ছিলেন তাই তাঁকে মুসলমান ধর্মমতে কবর দিতে হবে। দু-পক্ষ দু-রকম দাবি করে বাদবিতণ্ডা বাড়িয়ে তুললেন এবং

শেষ পর্যন্ত এই বাদানুবাদ রণসজ্জায় পরিণত হল। দুদিক থেকেই তরবারি বেরল এবং যুদ্ধের বাজনা বেজে উঠল। ঠিক এমন সময় এক বজ্রগম্ভীর দৈববাণী দুই পক্ষের কলরব স্তব্ধ করে দিয়ে বলে উঠল, "অনর্থক তোমরা এই যুদ্ধে মেতেছ। এই যুদ্ধ থামাও। আগে কুটীরের দরজা খুলে দেখো—সেখানে কি হয়েছে!"

তৎক্ষণাৎ দরজা খোলা হল। কিন্তু কোথায় গেল কবীর-সাহেবের শব! সকলেই বিস্ময়ে হতভম্ব! কেবল মেঝেতে পড়ে আছে একরাশ ফুল একখানি চাদরের ওপর। এবার তাদের বিশ্বাস হল যে মহাত্মা কবীর সশরীরেই লোকান্তরিত হয়েছেন। কুটীরের ভিতরে প্রাপ্ত চাদর ও ফুলগুলিকে হিন্দু ও মুসলমানেরা ভাগ করে নিয়ে গিয়ে কবীরের পবিত্র দেহাবশেষ জ্ঞানে যাঁর যাঁর ধর্মমত অনুসারে সৎকার করলেন।

গরীবদাসজী বলেছেন—

কাসী তজ কর মগহর চালে, কিয়া কবীর পয়ান।
চন্দর ফুল্ল বিছে হী ছাঁড়ে, সব্দে সব্দ সমান॥

মলুকদাসজী বলেছেন—

কাসী তজি গুরু মগহর আএ, দোউ দীনন কে পীর।
কোই গাড়ে কোই অগ্নি জরাবৈ, নেক ন ধরন্তে ধীর॥
চার দাগ সে সৎগুরু ন্যারা অজরো অমর সরীর।
দাস মলুক সলুক কহত হ, খোজো খসম কবীর॥

চার দাগ বলতে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎকে বোঝায়। কবীরের দেহ এই চতুর্ভূতের উর্ধ্বে ছিল—ভক্তদের এইরূপ বিশ্বাস।

কোনো কোনো গবেষক এই কাহিনীর অন্তরালে এক রহস্যের সন্ধান পেয়েছেন। তাঁদের ধারণা এই যে, এমন এক পরিবারে কবীরের জন্ম হয়েছিল যাঁরা মৃতদেহ দাহ করে ভস্মাবশেষের ওপর সমাধিও রচনা করতেন। গবেষকদের বিশ্বাস এই যে তখন এমন-কোনো যোগীশ্রেণীর লোক ছিলেন যাঁরা এখন হিন্দু থেকে মুসলমান হয়েছেন। এই শ্রেণীর লোকেরাই হিন্দু এবং মুসলমান উভয় ধর্মেরই রীতিনীতি একই সঙ্গে মেনে চলেন। এঁরা কাটাই-বোনাই-এর কাজই বেশি করেন। সম্ভবতঃ কবীরসাহেবের জন্ম এমনই-কোনো এক পরিবারে হয়েছিল। বহু পুরনো জীবনীগ্রন্থেও ফুল-সম্পর্কিত কোনো ঘটনার উল্লেখ নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ অনন্তদাসের 'পরচঈ'-গ্রন্থের কথা বলা যায়। এই গ্রন্থে কবীরের মগহর যাত্রার এবং সেখানে দেহত্যাগের বর্ণনা রয়েছে, কিন্তু কবীরের শবের পরিবর্তে ফুল পড়ে ছিল এরকম চমকপ্রদ কোনো কথার উল্লেখ একেবারেই নেই।

যাই হোক, এ-কথা অন্ততঃ নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে কবীরের মৃত্যু মগহরেই হয়েছিল। কারণ তাঁর স্বরচিত দুটি পদেও তিনি জানিয়েছেন যে জীবনের অন্তিম সময়ে তিনি মগহরে এসে-ছিলেন। সেখানে আসার অন্য যে কারণই থাকুক-না কেন, উক্ত পদে তিনি যে কাশী ও মগহর সম্বন্ধে প্রচলিত কুসংস্কার দূর করার প্রয়াস করেছেন, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। উক্ত পদের একটি থেকে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করি :—

অব কহু রাম কবন গতি মোরী।
তজিলে বনারস মতি ভঈ থোরী॥

সগল জনম সিবপুরী গঁবায়া।
মরতী বার মগহর উঠি আয়া॥
বহুত বরিস তপু কীয়া কাসী।
মরনু ভয়া মগহর কী বাসী॥

অন্য একটি পদে তাঁর আত্মবিশ্বাসের আলোর ঝলকানি দেখা যায় :—

লোগা তুম হো মতি কে ভোরা।
জউ কাসী তনু তজহি কবীরা তৌ
রামহিঁ কৌন নিহোরা॥
জো জন ভাউভগতি কছু জানৈ তাকৌ অচরজু কাহো।
জৈসে জল জলহীঁ ঢুরি মিলিয়ৌ ত্যৌঁ
ঢুরি মিল্যৌ জুলাহো॥
কহৈ কবীর সুনহু রে লোঈ মরভি ন ভুলৌ কোঈ।
ক্যা কাসী ক্যা মগহর উখর্‌ রাঁম জো হোঈ॥

তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ভাবভক্তির জোরেই তিনি মগহরে মরেও প্রভু রামের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে যেতে পারবেন। জলের সঙ্গে যেমনভাবে জল মিশে একাকার হয়ে যায় তেমনি হৃদয়ে যার রাম ছাড়া কিছু নেই, সে কাশীতে মরলেও রামকে পাবে, মগহরে মরলেও রামকেই পাবে। কাশীতে মরে যার মুক্তি ঘটে, তার কাছে রামের মাহাত্ম্য আর থাকে কোথায়?

মগহরে যে কবীরের মৃত্যু হয়েছিল সে বিষয়ে কোনো মতভেদ না থাকলেও, কবে তিনি দেহত্যাগ করেছিলেন সেই সন তারিখ

নিয়ে নানা মুনির নানা মত। কবীরের মৃত্যুর কাল সম্বন্ধে চারটি ভিন্ন ভিন্ন মত জানা যায়। যিনি যা বলেছেন পদ্যছন্দে সে-সমস্ত লিখিত আছে। যথা—

১. সংবত পন্দ্রহ সৌ পচহত্তরা, কিয়া মগহর কো গৌন।
মাঘসুদী একাদসী, রলৌ পৌন মেঁ পৌন॥
২. পন্দ্রহ সৌ ঔ পাঁচ মেঁ, মগহর কীন্ হোঁ গৌন।
অগহন সুদি একাদসী, মিল্যৌ পৌন মেঁ পৌন॥
৩. পন্দ্রহ সৌ ঊনচাস মেঁ, মগহর কীন্ হোঁ গৌন।
অগহন সুদি একাদসী, মিলো পৌন মেঁ পৌন॥
৪. সংবত পন্দ্রহ সৌ ঊনহত্তরা রহাঈ।
সৎগুরু চলে উঠি হংসা জ্যাঈ॥

প্রথম দোহাটির দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে কোনো কোনো স্থলে আবার 'আহনসুদি একাদসী' তিথিও পাওয়া যায়। এ সমস্ত পদ্য লোকের মুখে মুখেই চলে আসছে; কে বা কারা যে এগুলি রচনা করেছেন তার কোনো ইতিহাস নেই। যা হোক কবীরপন্থীরা প্রথম দোহাটিকেই অধিকতর নির্ভরযোগ্য মনে করেন এবং বলেন যে ১৫৭৫ সংবতেই কবীরের তিরোধান হয়েছিল। এই হিসেব মতে তাঁরা ১৪৫৬ সংবতের জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তির দিন থেকে ১৫৭৫ সংবতের অগ্রহায়ণের শুক্লা একাদশী পর্যন্ত ১১৯ বৎসর ৫ মাস ২৭ দিন সময়কে কবীরের জীবনকাল বলে মেনে থাকেন। বাবু লহনাসিংহ নামে একজন কবীরপন্থী তাঁর স্বরচিত 'কবীর কসৌটী' নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে ১৫৭৫ সংবতের মাঘমাসের শুক্লা একাদশী বুধবার দিনে

কবীরসাহেব মগহর যাত্রা করেছিলেন এবং ঐ দিনেই তিনি সেখানে পৌঁছেন এবং দেহত্যাগ করেন। কিন্তু ১৫৭৫ সংবতের মাঘের শুক্লা একাদশীর দিনটি বুধবার ছিল না, সেদিন ছিল মঙ্গলবার।

অথচ আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে বিজলী খাঁ বস্তী জেলার পূর্ব দিকে 'আমী' নদীর দক্ষিণ তীরে কবীরসাহেবের এক স্মৃতিসৌধ ১৪৫০ সনে অথবা ১৫০৭ সংবতে নির্মাণ করেন। ১১৩ বছর পরে ১৫৬৭ সনে অথবা ১৬২৪ সংবতে নবাব ফিদাই খাঁ উক্ত স্মৃতিসৌধটি মেরামত করান। এ থেকে জানা যায় যে কবীরসাহেবের মৃত্যু ১৫০৫ সংবতেই হয়ে গিয়েছে; কারণ কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পরেই তো তাঁর স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা সম্ভব! এইজন্য বলা যায় যে কবীরসাহেবের মৃত্যু সম্বন্ধে লেখা দ্বিতীয় দোহাটির যাথার্থ্যই বেশি। একদিক থেকে দেখা যায় যে প্রথম দোহাতে যে 'সংবত পন্দ্রহ সৌ পচহত্তরা' বলা হয়েছে সেটিই মূলত ১৫০৫ সংবৎ হবে। দাদূপন্থী রাঘবদাস তাঁর রচিত ভক্তমালের রচনা তারিখ "সংবত সত্রহ সৌ সত্রহোতরাঁ" এমনভাবে দিয়েছেন যে যার মানে দাঁড়ায় ১৭১৭ অথবা ১৭৭০ সংবৎ। এই ভাবেই কবীরের মৃত্যুর সংবৎ ও প্রথমে "পন্দ্রহ সৌ পাঁচোত্তরা" (১৫০৫) বলেই প্রসিদ্ধ ছিল; আবার ঐটিই বিকৃত হয়ে শেষে ১৫৭৫ হয়ে থাকবে। 'পন্দ্রহ সৌ পচহোত্তরা' বলতে পনেরো'শ পাঁচ বোঝায়। এইভাবেই "সত্রহোত্তরা" বলতে সতেরো'শ সতেরো বোঝায়। 'উত্তর' অর্থে 'বাদ' অথবা 'পরে'ও বোঝায়। কাজেই মৃত্যুকালে কবীরের বয়স সম্ভবতঃ পঞ্চাশ বৎসর হয়েছিল।

প্রাচীন সাধুসন্ত বা ভক্তগণ নিজেদের সম্বন্ধে বেশি কথা তো বলতেনই না, বলার চিন্তাও করতেন না। তবু যদি কখনও কিছু বলতেন তো তাতে নিজেদের বিনয়ই প্রকাশ পেত। তুলসীদাস, সুরদাস প্রভৃতি সম্বন্ধে এ-রকম কথাই শোনা যায়। পরবর্তীকালে সন্ত প্রাণনাথ প্রভৃতির দিনচর্যা সম্বন্ধে তাঁদের শিষ্যেরা বিস্তৃতভাবে যা লিখেছেন তা অধিকাংশই সত্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে কবীরের এ-রকম কোনো বিস্তৃত জীবনী পাওয়া যায় না। উপরে লিখিত বিবরণ থেকে আমরা নিঃসন্দেহ হই যে তাঁর জীবনী সম্বন্ধে মাত্র দুটি কথাই পূর্ণভাবে সত্য বলে মেনে নেওয়া চলে। উক্ত দুটি সত্যের একটি হল এই যে কবীর কাশীধামের জোলা-সম্প্রদায়ের লোক, অপরটি হল এই যে কবীর দেহত্যাগ করেছেন মগহরে। কিন্তু জাগতিক জন্ম-মৃত্যু সাধুদের কোনো মহত্ত্ব রক্ষা করে না। তাঁদের জীবনের কর্ম বা কীর্তিই তাঁদের রক্ষা করে। কবীরের জন্ম যেখানেই হোক-না কেন, যত দীনহীন পরিবারেই তিনি প্রতি-পালিত হোন-না কেন ; তিনি জগতের লোককে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন যে মানুষ জন্মসূত্রেই বড় হতে পারে না, কর্মদ্বারাই বড় হতে পারে। নাভাদাসজী ভক্তমালগ্রন্থে কবীরের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—

"কবীর কানি রাখী নহীঁ, বর্ণাশ্রম খট দরসনী"।

(কবীর না রেখেছে বর্ণাশ্রম, না রেখেছে ষড়্‌দর্শন) পরমেশ্বরের প্রতি তাঁর পরিপূর্ণ বিশ্বাস ছিল। নিজের একনিষ্ঠ সাধনায় তিনি উচ্চ মার্গে পৌঁছে ক্রমে ক্রমে 'একমেব' হয়ে গেলেন।

তাঁর ভেদবিচার লুপ্ত হল ; এজন্য তিনি নিজেকে 'অমর' বলে জানলেন। তিনি তাই বলেছেন :

হঁম ন মরৈঁ মরিহৈ সংসারা।
হঁুম কোঁ মিলা জিয়াবনহারা॥
হরি মরিহৈ তৌ হঁমহুঁ মরিহৈ।
হরি ন মরৈ হঁম কাহে কো মরিহৈ॥
কহৈ কবীর মন মনহিঁ মিলাবা।
অমর ভয়ে সুখসাগর পাবা॥

কবীর সত্যসত্যই অমর হলেন। তাঁর নশ্বর দেহটাই শুধু মরল। তাঁর কীর্তির মরণ নেই। তিনি সত্যের মুখোমুখি হতে পেরেছিলেন, তিনি সুখসাগরে নিত্যনিমগ্ন।

কবীরসাহেবের বাণী

—পদাবলী—

(১)

হঁমারৈ গুর বড়ে ভ্রিংগী ॥
আঁনি কীটক করত ভ্রিংগ সো আপতৈঁ রংগী ॥
ধুয়া ॥

পাইঁ ঔরৈ পংখ ঔরে ঔর রংগ রংগী।
জাতি পাঁতি ন লথৈ কোঈ ভগত ভৌ ভংগী ॥১॥
নদী নালা মিলে গংগা কহাবৈঁ গংগী।
সমানীঁ দরিয়াব দরিয়া পার নাঁ লংঘী ॥২॥
চলত মনসা অচল কীন্হীঁ মাহিঁ মন পংগী।
তত্ত মৈঁ নিহতত্ত দরসা সংগ মৈং সংগী ॥৩॥
বন্ধ তৈঁ নিবন্ধ কীয়া তোরি সব তংগী।
কহৈ কবীর অগম কিয়া গম রাঁম রংগ রংগী ॥৪॥

আমার গুরু ঠিক ভ্রমরের মতো। আপন ভাবমাধুরী দিয়ে তিনি অপর কীটকেও ভ্রমর বানিয়ে তোলেন। তার পা ও পাখা অন্যরকম হয়, সে অন্যরূপ ধরে—অর্থাৎ ভ্রমরের সংস্পর্শে এসে সেও ভ্রমরের মতো খেয়ালী হয়। জাত বিচার কেউ করে না। মুচিও শুচি হয়। নদীনালা যদি গঙ্গায় মিশে তখন গঙ্গা বলেই কথিত হয়। আবার নদী যদি সমুদ্রে মিশে তখন আর তার নামধাম সীমা সরহদ্দ থাকেনা। গুরু চঞ্চল মন স্থির করে দিলেন। মন আর বাইরের দিকে এলনা, ভিতরেই

থেকে গেল অর্থাৎ অন্তর্মুখী হল। পঞ্চতত্ত্বের স্থূল দেহেতে তত্ত্বাতীত সূক্ষ্ম ব্রহ্মের দর্শন হল। সকল বন্ধন ছিন্ন করে গুরু আমাকে রাম-রঙে রাঙিয়ে দিলেন ; অগম্যকে গম্য করলেন— অর্থাৎ আমি অভিপ্রেত লাভ করলাম—কবীর এরূপই বলেছেন।

(২)

গোকুল নাইক বীঠুলা মেরা মন্নু লাগা তোহিঁ রে।
বহুতক দিন বিছুরেঁ ভএ তেরী ঔসেরি
আবৈ মোহিঁরে ॥ ধুয়া ॥

করম কোটি কৌ গ্রেহ রচ্যৌ রে নেহ গএ কী আস রে।
আপহিঁ আপ বঁধাইয়া দোহ লোচন মরহিঁ
পিয়াস রে ॥১॥

আপা পর সঁমি চিন্হিএ তব দীসৈ সরব সমাঁন।
ইহিঁ পদ নরহরি ভেঁটিয়ে তু ছাঁড়ি
কপট অভিমান রে ॥ ২ ॥

নাং কতহুঁ চলি জাইএ নাং লীজৈ সিরিভার।
রসনাং রসহিঁ বিচারিএ সারংগ স্ত্রী রংগ ধার রে ॥ ৩ ॥

সাধন তৈঁ সিধি পাইএ কিংবা হোইম হোই।
জে দিঢ় গ্যাঁন ন উপজৈ তৌ অহটি
মরৈ জনি কোই রে ॥ ৪ ॥

এক জুগুতি এক মিলৈ কিংবা জোগ কি ভোগ।
ইন দোনিউঁ ফল পাইএ রাঁম নাঁম সিধি জোগ রে ॥৫॥

তুমৃহ জিনি জানৌ গীত হৈ যহু নিজ ব্রহ্ম বিচার।
কেবল কহি সমঝাইয়া আতম সাধন সার রে ॥৬॥
চরণ কঁবল চিত লাইএ রাঁম নাঁম গুণ গাই ॥
কহৈ কবীর সংসা নহীঁ ভুগুতি মুকুতি
গতি পাই রে ॥৭॥

হে গোকুল নায়ক বিঠ্‌ঠল, আমার মন তোমাতেই নিবদ্ধ। বহুদিন আমি ভুলেই ছিলেম! এবার মনে পড়ল তোমাকে। কোটি কর্মের এই দেহ অথবা দেহরূপী জগতে থাকার জন্য যে ঘর বানালাম এবং মায়াতে বদ্ধ হলাম তাতে আমি নিজেকেই নিজে বেঁধে ফেল্লাম। তোমাকে আর দেখতে পাচ্ছিলাম না, তাই তোমাকে দেখার তৃষ্ণা আকুল হয়ে উঠেছে। আপনাকে এবং পরকে সমদৃষ্টিতে দেখতে পারলে তবেই নরহরিকেও দেখা যায়। তাই বলি, মন তুই কপটতা আর অহঙ্কার ছাড়। কোথায়ও আর যেতে হবে না, মাথায় পুঁথিজ্ঞানের বোঝাও বইতে হবে না, ঘরে বসেই শ্রীরঙ্গ সারঙ্গমের নাম রস পান করতে হবেঁ; তাঁকেই ধ্যান করতে হবে। সাধনাতে সিদ্ধিলাভ তো হয়; কিন্তু সাধনা করলেই সিদ্ধ হতে পারবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। যদি পরিচ্ছন্ন জ্ঞানের উন্মেষ নাই হয় তাহলেও নিরাশ হবে না; কারণ একটি প্রচেষ্টায় তো একটি অভিপ্রেতই লাভ হবে—যোগ চাইলে যোগই পাবে, আর ভোগ চাইলে ভোগই। কিন্তু রামনামের জপসিদ্ধি হলে যোগ ভোগ দুইয়েরই আস্বাদ গ্রহণ করা চলে। ভেবোনা, এই নাম-গান অতি সাধারণ, এই আমাদের ব্রহ্মদর্শন। আমি শুধু আত্মদর্শনের মূল তত্ত্বই বললাম। রাম নাম জপ এবং রামগুণ

গান করে তাঁর চরণকমলে চিত্ত স্থির করতে হবে। কবীর বলছেন যে তুমি অবশ্যই ভোগ মোক্ষ উভয়ই পাবে।

(৩)

ইহু ধন মেরৈ হরি কে নাঁউঁ।
গাঁঠি ন বাঁধউঁ বেঁচি ন খাঁউঁ॥ ধুয়া॥
নাঁউঁ মেরৈ খেতী নাঁউঁ মেরৈ বারী।
ভগতি করউঁ জন সরনি তুম্হারী॥১॥
নাঁউঁ মেরৈ মায়া নাঁউঁ মেরৈ পুঁজি।
তুমহিঁ ছাঁড়ি জানউঁ নহিঁ দূজী॥২॥
নাঁউঁ মেরৈ বঁধিপ নাঁউঁ মেরৈ ভাঈ।
অন্ত কী বেরিরাঁ নাঁউঁ সহাঈ॥৩॥
নাঁউঁ মেরৈ নিরধন জ্যুঁ নিধি পাঈ।
কহৈ কবীর জৈসৈ রংক মিঠাঈ॥৪॥

এই হরিনামের ধনই আমার আছে। এই রত্ন আমি লুকিয়ে রাখতে পারি না। এই রত্ন আমি বিক্রী করে খেতেও পারিনা। এই নামেরই বাড়িঘর আমার, নামেরই আমার ক্ষেত খামার। আমি'ত সেবক। তোমার আশ্রয়ে থাকি, তোমারই ভজনা করি। আমার তো নামই সম্পদ, নামই আমার বিভব। তোমাকে ছাড়া অন্য কিছুই আমি জানি না। নামই আমার ভাই, নামই আমার বান্ধব। অন্তিমকালেও নামই আমার সম্বল। নির্ধনের কাছে মণিমাণিক্য যতখানি, নামও আমার কাছে ঠিক ততখানি। কবীর বলেন, ভিখারী যদি মিঠাই

হাতে পায় তাতে তার যে আনন্দ হয়, নাম ধন আর নাম রত্ন পেয়ে আমারও তেমনই আনন্দ। আমি যে নামেরই কাঙাল।

(৪)

তেরা জন্‌ এক আধ হৈ কোঈ।
কাঁম ক্রোধ লোভ মোহ বিবরজিত হরিপদ চীন্‌হৈঁ
সোঈ॥ ধুয়া॥
অসতুতি নিন্দা দোউ বিবরজিত তজহিঁ মান্‌
অভিমাঁনাঁ।
লোহা কঁচন সম করি জাঁনহিঁ তে মূরতি ভগবানা॥১॥
রজগুন তমগুন সতগুন কহিএ যহ সব তেরী মায়া।
চউথে পদ কোঁ জো জন চীন্‌হৈ তিনহেঁ।
পরম পদ্‌ পায়া॥২॥
চিন্তৈ তৌ মাধব চিন্তামণি হরিপদ রমৈ উদাসা।
চিন্তা অরূ অভিমাঁন রহিত হৈ কহৈ কবীর
সো দাসা॥৩॥

হে রাম, তোমার ভক্ত এক আধজনই হয়ে থাকে। কাম ক্রোধ লোভ মোহ থেকে যে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে কেবল তারই পক্ষে ঈশ্বরের পরিচয় পাওয়া সম্ভব। যে নিন্দা প্রশংসা দুইই ছেড়েছে, যার মান-অপমান দুইই সমান, লোহা আর সোনাকে যে একই রকম দেখে সে তো নিজেই স্বয়ং ভগবান। সত্ত্বগুণ, রজোগুণ, তমোগুণ সমস্তই তোমারই মায়া। চতুর্থ দরজা যে ভক্তের জানাশোনা আছে সে-ই

পায় পরম আশ্রয়। যদি চিন্তা কারও করতে হয় তবে মাধবরূপী চিন্তামণির চিন্তাই করবে। তিনিই সমস্ত দুশ্চিন্তা দূর করবেন। নিরাসক্তভাবে পরমপদ লাভের আনন্দ উপভোগ কর। যে চিন্তাভাবনা আর অভিমান-মুক্ত, কবীর কহেন, কেবল সেই হতে পারে অকৃত্রিম ভক্ত বা সেবক।

(৫)

বাবা অব ন বসউঁ যহি গাঁউঁ।
ঘরী ঘরী কা লেখা মাঁগৈ কাইথ চেতু নাঁউ॥ ধুয়া॥
দেহী গাঁবাঁ জিউধর মহতৌ বসহিঁ পঞ্চ কিরসাঁনাঁ।
নৈনুঁ নকটূ স্রবনুঁ রসনুঁ ইন্দ্রীঁ কহা ন মাঁনা॥১॥
ধরমরাই জব লেখা মাঁগৈ বাকী নিকসী ভারী।
পঞ্চ ক্রিসনবাঁ ভাগি গএলৈ বাঁধ্যো জিউ দরবারী॥২॥
কহৈ কবীর সুনহু রে সন্তহু খেতহিঁ করহু নিবেরা।
অব কী বের বখসি বন্দে কৌ বহুরি ন
ভৌজলি ফেরা॥৩॥

আরে বাবা, এখন এই গায়ে (দেহে) থাকবনা ; কারণ এখানে কায়স্থ (লেখক) চিত্রগুপ্ত (চিত্ত) প্রহরে প্রহরে হিসেব চাইছে। দেহরূপী গাঁয়ের মোড়ল হলেন এর প্রাণধারী আত্মা ; আবার গাঁয়ের পাঁচজন কৃষাণের নাম হল নয়ন, নাসিকা, শ্রবণ, রসনা এবং ইন্দ্রিয়গণ (ত্বক ?) ; এরা এমনই স্বেচ্ছাচারী যে কারও কথাই শোনেনা। যম যখন চিত্রগুপ্তের খাতা দেখতে চাইলেন তখন দেখা গেল যে পুণ্যের ঘরে

শূন্য আর পাপের ঘর বোঝাই। এই দেখে পাঁচ কৃষাণ তো ছুটে পালাল। তখন যমদূতেরা জীবাত্মাকেই বেঁধে নিয়ে গেল। কবীর বলছেন হে সাধু শোনো—খেতের (দেহের) আগাছা ভালো করে উপড়িয়ে নাও। এবার বন্দাকে দয়া করে ছাড়ো, আর যেন এই ভবসাগর পাড়ি দিতে না হয়।

(৬)

তা মন কোঁ খোজহু রে ভাঈ।
তন ছুটে মন কঁহা সমাঈ॥ ধুয়া॥
সনক সনন্দন জৈদেউ নাঁমা। ভগতি করী মন উনহুঁ
ন জাঁনাঁ॥১॥
সিব বিরঞ্চি নারদ মুনী গ্যাঁনীঁ। মন কী গতি উনহুঁ
নহিঁ জাঁনীঁ॥২॥
ধ্রুব প্রহ্লাদ বিভীষণ সেখা। তন ভীতর মন উনহুঁ
নহি পেখা॥৩॥
তা মন কা কোঈ জাঁনৈ ন ভেউ। তা মনি লীন ভয়া
সুখদেউ॥৪॥
গোরখ ভরয়রী গোপী চন্দা। তা মন সৌঁ মিলি করৈ
অনন্দা॥৫॥
অকল নিরঞ্জন সকল সরীরা। তা মন সৌঁ মিলি রহা
কবীরা॥৬॥

আরে ভাই সেই মনের অন্বেষণ কর। দেহ চলে গেলে পর মন কোথায় গিয়ে মিলায়? সনক সনন্দন জয়দেব নামদেব সবাই ভজন করেছেন কিন্তু মনকে তাঁরাও বুঝতে পারেননি। এমন কি শিব, ব্রহ্মা এবং জ্ঞানী নারদ মুনিও মনেরগতি জানতে পাননি। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, বিভীষণ এবং সহস্রানন শেষনাগও দেহমধ্যে মনের রহস্য দেখতে পাননি। সেই মনের রহস্য ভেদ করতেও কেউ জানতেন না। প্রকৃতপক্ষে শুকদেবই সেই মনে নিমগ্ন হয়েছিলেন। গোরখনাথ, ভর্তৃহরি এবং গোপীচন্দ্রও ওই মনের সঙ্গে মিলে গিয়ে আনন্দ উপভোগ করেছেন। যে সম্বন্ধে কিছু চিন্তাই করা যায়না আর যিনি নিরঞ্জন এবং সর্বভূতে বিরাজমান সেই মনের সঙ্গে কবীর মিলে গেলেন।

(৭)

অব মোহিঁ নাচিবৌ ন আবৈ।
মেরৌ মন মন্দরিয়া ন বজাবৈ॥ ধুয়া॥
ঊভর থা সো সূভের ভরিয়া ত্রিসনাঁ গাগরি ফুটী।
কাঁম চোলনাঁ ভয়া পুরাঁনাঁ গয়া ভরম সভ ছুটী॥১॥
জে বহু রূপ কিএ তে কীএ অব বহু রূপ ন হোঈ।
থাকী সোঁজ সঙ্গ কে বিছুরে রাঁম নাঁম বসি
হোঈ॥২॥
জে থে অচল অচল হৈ থাকে চুকে বাদ বিবাদা।
কহৈ কবীর মৈঁ পুরা পায়া ভয়া রাঁম পরসাদা॥৩॥

এখন আর আমার দ্বারা নাচ হয় না, আমার মন মাদল

বাজায় না, বাজাতেও চায়ও না। এখানে প্রথমে ভগবানের ধ্যান ছিল না, তাই ফাঁকা ছিল ; এখন এই মন ধ্যানে কাণায় কাণায় ভরা। তৃষ্ণার কলসী ফেটে গেল। কামনাবাসনার যে পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে অভিনয় করেছি—এখন সেও পুরনো হয়ে গেছে। যে ভ্রমবশতঃ নাচন কুঁদনে প্রবৃত্তি হত সেই ভ্রমও দূর হয়েছে। সংসার রঙ্গমঞ্চে যে রূপ পরিবর্তন ঘটে থাকে—সেই পরিবর্তন আমার ক্ষেত্রেও ঘটেছে, এখন আর নানা রঙের সঙ সাজতে যাই না। নাচগানের সব সামগ্রী যেমন ছিল তেমনি রয়েছে, সমাজীরা কেবল রামনামের বশ হয়ে ছেড়ে চলে গিয়েছে। যে চঞ্চল ছিল সে এখন স্থির হয়েছে। কবীর বলছেন ঃ রামের কৃপা হয়েছে ; আমি নাচের পুরা দক্ষিণাই পেয়েছি। অর্থাৎ আমি পূর্ণজ্ঞান লাভ করেছি।

(৮)

সন্তৌ ভাঈ আঈ গ্যাঁন কী আঁধী রে।
ভ্রম কী টাটী সবৈ উড়ানীঁ মায়া রহৈ ন
বাঁধী রে ॥ধুয়া॥
দুচিতে কী দোই থূঁনি গিরানীঁ মোহ বলেঁড়া টুটা।
ত্রিসনাঁ ছাঁনি পরী ধর উপরি দুরমতি ভাণ্ডা ফুটা ॥১॥
আঁধী পাছেঁ জো জল বরসৈ তিহিঁ তেরা জন ভীনাঁ।
কহৈ কবীর মণি ভয়া প্রগাসা উদৈ ভানু জব চীন্হাঁ ॥২॥

আরে সাধুভাই, জ্ঞানের ঝড় উঠেছে। ভ্রমের বেড়া সব অদৃশ্য হয়েছে। মায়ার বাঁধন আর নেই। দ্বিধা দ্বন্দ্বের দুটি

স্তম্ভই ভেঙে পড়েছে। মোহের বাঁধন খুলে গিয়েছে। তৃষ্ণার চাল মাটিতে পড়ায় কুবুদ্ধির ভাণ্ড ফেটেছে। জ্ঞানের এই ঝড়ের পর ভক্তিরসের যে বর্ষা নামল তাতে তোমার সেবক ভিজে লুতুবুতু হয়ে গেল। কবীর বলছেন, ভক্তিবারিতে যখন ঝড়ের বেগ প্রশমিত হল তখন উদয়োন্মুখ জ্ঞানসূর্যকে চিনতে পারা গেল এবং মনের মধ্যে হল সে সূর্যের অভ্যুদয়।

(৯)

রাঁম মোহি জরি কহাঁ লৈ জইহো।
সৌ বৈকুণ্ঠ কহো ধোঁ কৈসা করি পসাউ মোহি দইহো॥ ধুয়া॥
জউ তুম মোকোঁ টুরি করত হো তৌ মোহিঁ মুকুতি বতাবহু।
একমেক রমি রহা সভনি মৈঁ তৌ কাহে ভরমাবহু॥১॥
তারন তরনু তবৈ লগি কহিঐ জব লগি তত্ত্ব ন জাঁনাঁ।
এক রাঁম দেখা সবহিন মৈঁ কহৈ কবীর মন মাঁনাঁ॥২॥

হে রাম, আমাকে তরিয়ে কোথায় নিয়ে যাবে? সে কি বৈকুণ্ঠধাম! বলতো সত্যি করে কেমন সেই স্থান, যেটি তুমি কৃপা করে আমাকে দেবে? যদি তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিতে চাও তো আমার মুক্তির পথ বলে দাও। যখন সকল বস্তুতেই একাকার হয়ে মিশে গিয়ে তুমি আনন্দিত হচ্ছ, তখন আমাকে কেন ভুলিয়ে রাখছ? জ্ঞান যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণই তরণ-

তারণের কথা বলতে হয়। কবীর বলছেন, আমি তো সব কিছুতে এক রামকেই দেখেছি—আমার মনে তাঁরই প্রত্যয় জন্মেছে।

(১০)

বহুরি হঁম কাহেকৌ আবহিঁগে।
বিছুরৈ পঞ্চ তত্ত্ব কী রচনাঁ। তব হঁম রামহিঁ
পাবহিগে ॥ ধুয়া ॥
পিরসী কা গুন পাঁনীঁ সোখা পাঁনীঁ তেজ মিলাবহিঁগে।
তেজ পবন মিলি পবন সবদ মিলি সহজ সমাধি
লগাবহিঁগে ॥১॥
জৈসৈ বহু কঞ্চন কে ভূখন একহিঁ ধালি তবাবহিঁগে।
ঐসৈ হম লোক বেদ কে বিছুরৈ সুন্নিহিঁ মাঁহিঁ
সমাবহিঁগে ॥২॥
জৈসৈ জলহিঁ তরঙ্গ তরঙ্গিনী ঐসৈ হঁম
দিখলাব হিঁগে।
কহৈ কবীর স্বাঁমীঁ সুখসাগর হংসহিঁ হংস
মিলাবহিঁগে ॥৩॥

আবার এই সংসারে কি জন্য আসব? পঞ্চতত্ত্বের রচনা ছাড়লেই রামকে পাব। পৃথিবীর গুণ জল শুষে নেবে আর জল তেজের সঙ্গে মিশবে। তেজ পবনে মিলাবে। পবনকে শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে আমি সহজ সমাধিতে নিমগ্ন হব। যেমন

করে অনেক স্বর্ণালঙ্কার একটি পাত্রে রেখে গলানো হয় এবং শেষে সব একটি স্বর্ণতালে পরিণত হয় তেমনি ভাবে আমিও লোক সংসর্গ থেকে নিযুক্ত হয়ে শূন্যে মিলিয়ে যাব। জলের তরঙ্গের মতো আমিও পরমাত্মার সঙ্গে তরঙ্গিত হয়ে একাকার হব। কবীর বলছেন, আমার প্রভু সুখসাগর। আমি আমার হংসকে (আত্মা) হংসের (পরমাত্মার) সঙ্গে মেলাব।

এই পদে কবীর লয়যোগের কথা বলেছেন। পুরাণেও যত্রতত্র এর চর্চার উল্লেখ আছে। শুধু ভারতেই নয়, অন্য দেশের লোকেদের মধ্যেও সময় সময় এই কথা হুবহু মিলে যায়। আরিষ্টটল সিকন্দরের নামে এক চিঠিতে লিখেছেন, "পৃথিবীকে জল, জলকে বায়ু, বায়ুকে অগ্নি, অগ্নিকে আকাশ (ঈশ্বর) ঘিরে রয়েছে। এজন্য সবচেয়ে উচ্চে দেবতাদের স্থান, আর সকলের নীচে জলজন্তুদের আস্তানা।"

—সন্তরাম অনূদিত : আলবেরুনীর ভারত

(১১)

ডগমগ ছাড়ি দে মন বৌরা।
অব তৌ জরেঁ মরেঁ বনি আবৈ লীন্‌হৌ হাথি সিঁ ধৌরা।
॥ ধুয়া ॥

হোই নিসংক মগন হোই নাচৈ লোভ মোহ ভ্রম ছাড়ৌ।
সুরা কহা মরন তৈঁ ডরপৈ সতী ন সঞ্চৈ মাড়ৌ॥১॥
লোক বেদ কুল কী মরজাদা ইহৈ গলে মৈঁ ফাঁসী।
আধা চলি করি পাছেঁ ফিরিহৌ হোই জগত মৈঁ
হাঁসী॥২॥

যহ সংসার সকল হৈ মৈলা রাঁম কহৈঁ তে সূচা।
কহৈ কবীর নাঁউঁ নহিঁ ছাড়ৌ গিরত পরত চঢ়ি
উচাঁ। ॥৩॥

হে পাগল মন, পাগলামি ছাড়। এখন তো পুড়ে মরলেই কাজ হয়। কারণ, তুইতো সতীর মতো 'সিন্ধোরা' (সিঁদুরের কৌটা) হাতে নিয়েছিস্। নির্ভয়ে নিমগ্ন হয়ে নৃত্য কর। লোভ মোহের ভ্রম ছাড়। বীর কখনও মরতে ভয় পায়? সতী ভণ্ডামি সহ্য করে না। লোকাচার ও কুলগৌরব এই তো গলার ফাঁস। আধা পথ এসে পিছনে ফিরে গেলে তুই যে লোক হাসাবি। সংসারে সকলই অশুচি; যে জন রাম নাম করে সেই শুধু শুচি। কবীর বলেন, রামনাম ছাড়িস্‌নে; আছাড় হোঁচট খেতে খেতেই উপরে উঠে চল।

কবীর সতী আর বীরকে ভক্তের আদর্শ রূপে গ্রহণ করেছেন। (যেমন তুলসীদাসের আদর্শ চাতক) পুড়ে মরাই যাদের ধর্ম।

(১২)

বোলনাঁ কা কহিয়ে রে ভাঈ।
বোলত বোলত তত্ত নসাঈ॥ ধুয়া॥
বোলত বোলত বঢ়ে বিকারা। বিনু বোলেঁ ক্যা করহি
বিচারা॥১॥
সন্ত মিলহিঁ কছু সুনিঐ কহিঐ। মিলহিঁ অসন্ত মষ্টি
করি রহিঐ॥২॥

গ্যাঁনী সোঁ বোলেঁ উপকারী। মুরিখ সোঁ বোলে
ঝকমারী ॥৩॥
কহৈ কবীর আধা ঘট বৌলৈ। ভরা হোই তৌ কবহুঁ
ন বৌলৈ ॥৪॥

আরে ভাই, বলার কথা কি বলা যায়? বলে বলে তো তত্ত্ব নষ্ট হয়ে যায়। বলে বলে বিকার বেড়ে যায়। কিন্তু না বলে বিচারই বা কেমন করে করা চলে? ভালো হল এই যে সাধুসন্তের দেখা পাওতো দুটো কথা শোনো; অসতের দেখা পাওতো মৌন হয়ে চুপচাপ থেকে যাও। জ্ঞানীর বচনে ভালো হয়, মূর্খের ভাষণে ঝক্‌মারি হয়। কবীর বলেন, আধভরা কলসী শব্দ করে বেশি, ভরা কলসী মোটে শব্দ করে না।

(১৩)

ঝুটে তন কোঁ ক্যা গরবাবৈ।
মরৈ তৌ পল ভরি রহন ন পাবৈ ॥ ধ্রুয়া ॥
খীর খাঁড ঘৃত পিণ্ড সঁবারা। প্রাঁন গয়েঁ লৈ বাহরি
জারা ॥১॥
জিহিঁ সিরি রচি বাঁধন পাগা। সো সিরু চঞ্চু
সঁবারহিঁ কাগা ॥২॥
হাড় জরৈ জৈসৈ লকড়ী ঝুরী। কেস জরৈ জৈসে
ত্রিণ কৈ কুরী ॥৩॥
কহৈ কবীর নর অজহুঁ নরী জাগৈ। জম কা ডণ্ড
মুঁড় মহিঁ লাগৈ ॥৪॥

মিছে এই দেহের কি বড়াই করিস্ ; যে মরে গেলে পর একমূহূর্তও থাকতে পায়না নিজের বাড়িতে (মরার সঙ্গে সঙ্গেই শ্মশানে নিয়ে যাবার জন্য সকলে ব্যস্ত হয়)। ক্ষীর, খাঁড়, ঘি দিয়ে যে দেহকে প্রতিপালন করেছিস্, প্রাণ যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলিস্। যে মাথায় সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর করে পাগ্ড়ি বাঁধিস, সেই মাথাকে কাক ঠোঁট দিয়ে ঠোক্রায় আর বীভৎস করে তোলে! দেহ পোড়ার কালে হাড় পোড়ে যেন শুকনো কাঠের মতো। আর চুল পোড়ে যেন শুকনো খড়ের মতো। কবীর বলেন, এ-সব জেনেশুনেও জীবের চেতনা হয়না—যতক্ষণ পর্যন্ত যমরাজের ডাণ্ডা এসে মাথায় না পড়ে অর্থাৎ মৃত্যু এসে ধমক না দেয়।

(১৪)

মন রে অহরখি ৰাদ ন কীজৈ।
অপনা সুক্তিতু ভরি ভরি লীজৈ ॥ ধুয়া ॥
কুম্ভরা এক কমাঈ মাটী বহু বিধি বাঁনীঁ লাঈ।
কাহূ মহিঁ মোতী মুকতাহল কাহূ ব্যাধি লগাঈ ॥১॥
কাহূ দীনহাঁ পট পটম্বর কাহূ পলংঘ নিবারা।
কাহূ গরো গোঁদরী নাঁহীঁ কাহূ সেজ পয়ারা ॥২॥
সূমহিঁ ধন রাখন কৌঁ দীয়া মুগধ কহৈ যহু মেরা।
জম কা ডণ্ডু মুঁড় মহিঁ লাগৈ খিন মহিঁ নিবেরা ॥৩॥
কহৈ কবীর সুনোঁ রে সন্তো মেরী মেরী ঝুঠি।
চিরকুট ফারি চুহাড়া গয়ো তনীঁ তাগরী ছুটী ॥৪॥

হে মন, জীবিকার জন্য শুধু শুধু ঝঞ্ঝাট করিস্‌নে। কেবল সৎকর্ম করে যা আর তার পুরস্কার গ্রহণ কর। কুমোর যেমন একই মাটিকে তৈরি করে নিয়ে নানা রকমের জিনিস তৈরি করে, তেমনি কারও দেহে থাকে মণিমুক্তো আর কারও দেহে লাগে রোগব্যাধি (বিধাতা এক তত্ত্ব দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু গড়েন আর যার যার কর্মানুসারে ভাগ্য নির্ণয় করেন)। কাউকে দেন রেশমী কাপড়, কাউকে দেন নেওয়ারের শয্যা। ঠিক এর বিপরীত ছেঁড়া পচা মাদুর বা কাঁথাও আবার কারও ভাগ্যে জোটেনা—আবার কাউকে দেন তৃণশয্যা। কৃপণকে ধন সঞ্চয় করে রাখতে দেন—মূর্খ ভাবে এ আমার ধন; কিন্তু যখন যমরাজ ডাণ্ডা মারেন মাথায়, তখন মুহূর্তেই মীমাংসা হয়ে যায়—বোঝা যায় ধনের প্রকৃত মালিক কে।

কবীর বলেন, হে সন্ত শোনো, 'আমার আমার' করা বৃথা (সংসারে কিছুই কারও নয়)। এমন কি মৃত্যুর পরে মৃতের ছেঁড়া কানিটুকুও ডোম টেনে খুলে নেয়। মৃতের করধনীও (কোমরের বস্ত্র) এখানেই খসে যায়।

শবদাহকালে সকল বন্ধনই খুলে দেওয়া হয়, কাজেই কবীরের বক্তব্য এই যে অন্তিমকালে তাগা-তাবিজও আর সঙ্গে থাকেনা।

(১৫)

হরি নাঁব ন জপসি গঁবারা।

ক্যা সোচহি বারংবারা॥ ধুয়া॥

পঞ্চ চোর গঢ় মঞ্ঝা। গঢ় লুটহিঁ দিবসউ সংঝা॥

জউ গঢ়পতি মুহকম হোঈ।
তৌ লুটি সকৈ না কোঈ ॥১॥
অঁধিয়ারৈ দীপক চহিঐ। তব বস্তু অগোচর লহিঐ ॥
জব বস্তু অগোচর পাঈ। তব দীপক রহা সমাঈ ॥২॥
জৌ দরসন দেখা চহিঐ। তৌ দরপণ সাঞ্জত রহিঐ ॥
জব দরপণ লাগৈ কাঈ। তব দরসন কিয়া ন জাঈ ॥৩॥
কা পঢ়িএঁ কা গুণিএঁ। কা বেদ পুরাঁনাঁ সুনিএঁ ॥
পঢ়ে গুনেঁ ক্যা হোঈ। জউ সহজ ন মিলিঔ সোঈ ॥৪॥
কহৈ কবীর মৈঁ জাঁনাঁ। মৈঁ জাঁনা মন পতিয়াঁনাঁ।
পতিয়াঁনাঁ জৌ ন পতীজৈ। তৌ অন্ধে
কৌঁ কা কীজৈ ॥৫॥

হে অজ্ঞান, হরির নাম জপছিস্ না? বারে বারে কি তুই ভাবছিস? দেহেতে পাঁচটা চোর আছে (পঞ্চ বিকার অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়)। এরা রাতদিন দেহকে লুটে খাচ্ছে। মন যদি সচেতন হয় তো দেহকে কেউ লুটতে পারে না। অন্ধকারে আলো চাই, তখনই অদৃশ্য বস্তু দৃশ্য হয়। যখন অদৃশ্য বস্তু পাওয়া যায়, তখন আর আলোর দরকার থাকেনা। (তখন জ্ঞানের আর আবশ্যক হয়না)। যদি দর্শন করতে চাও তো দর্পণ পরিষ্কার করতে থাকো। যখন দর্পণে ময়লা জমে যায় (চিত্তে বিকার আসে) তখন প্রতিকৃতি ধরা পড়ে না (যথার্থ স্বরূপের সঙ্গে পরিচয় ঘটেনা।)। লেখাপড়া করে বা বেদপুরাণ শুনে কি হয়? পরমাত্মাকে যদি সহজেই না পাওয়া

যায়, তবে এ-সমস্তই বৃথা। কবীর বলেন, আমি তো আসল কথা জেনে ফেলেছি; আমি যে জেনেছি একথা আমার মন মেনে নিয়েছে। প্রতীতি যাঁর হয়ে গেছে তাঁকে যদি কেউ বিশ্বাস না করে সেই অন্ধকে (বিবেকহীন, বিশ্বাসহীন) নিয়ে কি আর করা যাবে ?

(১৬)

মেরী মেরী করতাঁ জনম গয়ৌ।
জনম গয়ৌ পরি হরি ন কহৌ॥ ধুয়া।

বারহ বরস বালপন খোয়া বীস বরস কছু তপ ন কিয়ৌ।
তীস বরস তৈঁ রাঁম ন সুমিরয়ৌ ফিরি পছিতানাঁ বিরিধ ভয়ৌ॥১॥
সূখে সরবরি পালি বঁধঁবৈ লুনেঁ খেতি হঠি বাঁরি করৈ।
আয়ৌ চোঁর তুরঙ্গহিঁ লৈ গয়ৌ মেঁহড়ী রাখত মুগধ ফিরৈ॥২॥
সীস চরণ কর কম্পন লাঁগে নৈঁন নীরু অসরাল বহৈ।
জিভ্যা বচন সুধ নহিঁ নিকসৈ তব সুক্তিত কী বাত কহৈ॥৩॥
কহৈ কবীর সুনহু রে সন্তৌ ধন সঞ্চৌ কছু সংগি ন গয়ৌ।
আঈ তলব গোপাল রাঈ কী মায়া মন্দির ছাঁড়ি চল্যৌ॥৪॥

'আমার-আমার' করতে করতে জীবন চলে গেল। জীবন চলে গেল, কিন্তু হরির নাম উচ্চারণ করলি না। আয়ু থেকে বারো বছর ছেলেবেলায় নষ্ট করলে, কুড়ি বছর পর্য্যন্ত কোনো তপস্যা করলে না। ত্রিশ বছর পর্যন্ত রাম নাম স্মরণ করলে না, তারপর এখন অনুশোচনা করছ যে বুড়ো হয়ে গেলাম। পুকুর শুকিয়ে গেলে পর পাড় বাঁধতে লেগেছ? ফসল কাটার পর জমিতে বেড়া লাগাচ্ছ? চোর এল, ঘোড়া চুরি করে নিল, আর তুমি মূর্খ, ঘোড়ার শূন্য আস্তাবল পাহারা দিচ্ছ? বার্দ্ধক্য-বশে যখন মাথা, পা, আর হাত কাঁপতে শুরু করেছে, চোখ দিয়ে অহরহ জল ঝরছে, জিভ দিয়ে স্পষ্ট কথা বেরচ্ছেনা, তখন তুই সৎ কাজ করার কথা ভাবছিস? কবীর বলছেন, হে সন্ত শোনো, লোকেরা ধন সঞ্চয় করল, কিন্তু অন্তিম সময় কিছুই তাদের সঙ্গে গেল না। গোপাল রায়ের ডাক যখনই এল তখনই ধনজন সব ছেড়ে চলল।

(১৭)

মন রে সংসার অন্ধ কুহেরা।
সিরি প্রগটা জম কা পেরা ॥ ধুয়া ॥

বুত পূজি পূজি হিন্দু মুত্র তুরূক মুত্র হজ জাঈ ॥
জটা ধারি জোগী মুত্র তেরী গতি কিন্হুঁ ন পাঈ ॥১॥
কবিত পঢ়ে পঢ়ি কবিতা মুত্র কাপড়ী কৈদারৈ জাঈ।
কেস লুঁচি লুঁচি মুত্র বরতিয়া ইনমৈঁ
কিনহুঁ ন পাই ॥২॥

ধন সঞ্চতে রাজা মুত্র গড়িলে কঞ্চন ভারী।
বেদ পঢ়ে পঢ়ি পণ্ডিত মুত্র রূপ দেখি দেখি নারী ॥৩॥
রাঁম নাঁম বিনু সভৈ বিগুতে দেখহু নিরখি সরীরা।
হরি কে নাম বিনু কিনি গতি পাঈ কহৈ জুলাহ
কবীরা ॥৪॥

হে মন, এই সংসার অন্ধকার কুয়াশা, কিন্তু মাথার ওপর যমের ফাঁদ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। মূর্তি পূজা করে করে হিন্দু মরে গেল আর মুসলমান হজ করে করে মরল। যোগী মরল জটাধারণ করে করে। কিন্তু তোর ঠিকানা কেউই পেল না। কবিরা কবিতা পড়ে পড়ে মরে গেল, কাপড়ী সন্ন্যাসী মরল কেদার বদরী গিয়ে গিয়ে। কেশ উৎপাটন করে করে জৈন ব্রতধারী মরল—এদের কেউই তোমাকে পেলনা। ধন সংগ্রহ করতে করতে রাজা মরে গেল কিন্তু রাশি রাশি স্বর্ণপিণ্ড মাটির নীচে পোঁতাই রয়ে গেল। বেদ পড়ে পড়ে পণ্ডিত মরল। রূপের গরবে গরবিনী নারীরা মরল। রাম নাম বিনা সবাই নষ্ট হয়ে গেল। নিজেই দেহের ভালোমন্দ পরীক্ষা করে নিয়ে এই কথা বুঝে নাও। হরির নাম বিনে কেমন করে সদ্গতি হবে এই কথাই জোলা কবীর বলছেন।

(১৮)

জতন বিনু মিরগনি খেত উজারে।
টারে টরত নহীঁ নিস বঁসুরি বিভরত নাঁহিঁ বিভারে॥
ধুয়া॥

অপনেঁ অপনেঁ রস কে লোভী করতব ন্যারে ন্যারে।
অতি অভিমাঁন বদন নহিঁ কাহু বহুতে লোগ পচি
হারে ॥১॥
বুধি মেরী কিরখী গুর মেরৌ বিঝুকা অকিখর দোই
রখবারে।
কহৈ কবীর অব চরনন দেইহোঁ বেরিয়াঁ ভলী
সঁভারে ॥২॥

বিনা যত্নে হরিণ খেত উজার করল। রাতদিন তাড়ালেও নড়ে না, সরাতে চাইলেও সরে না। সবাই নিজ নিজ স্বাদের লোভে অটল, এদের করণকারণ ভিন্ন ভিন্ন (কেউ ফসল নষ্ট করে, কেউ জমি গর্ত করে দেয়)। কত লোক হয়রান হয়ে গেল ; কিন্তু অধিক অভিমানের জন্য এরা কাউকেই গ্রাহ্য করে না। কিন্তু আমার চাষ বুদ্ধির চাষ, গুরু সেখানে প্রহরী, রামনামের দুই অক্ষর এখানে রক্ষাকর্তা। কবীর বলেন, আমি ঠিক সময়ে সামলে নিয়েছি, এখন আর খেতে ওদের চরতে দেব না।

(১৯)

কায়া বৌরী চলত প্রাঁণ কঁহে রোঈ।
কহত হংস সুন কায়া বৌরী মোর তোর সঙ্গ ন
হোঈ ॥ ধুয়া ॥
কায়া পাই বহুত সুখ কীনহাঁ নিত উঠি মলি মলি ধোঈ।
সো তন ছিয়া ছার হোই জৈহৈ নাউঁ ন লেই হৈ
কোঈ ॥১॥

সিব সনকাদি আদি ব্রহ্মাদিক সেস সহস মুখ জোঈ।
জিন জিন দেহ ধরী ত্রিভুবন মৈঁ থির ন রহা হৈ
কোঈ ॥২॥
পাপ পুন্নি দোহ জনম সংঘাতী সমুঝি দেখু নর লোঈ।
কহৈ কবীর প্রভু পূরন কী গতি বুঝে বিরলা
কোঈ ॥৩॥

পাগলী কায়া, প্রাণ যাওয়ার সময় কাঁদিস কেন? হংস (আত্মা) বলছে—হে পাগলী কায়া, শোন, তোর-আর আমার সঙ্গ হয়না। দেহ পেয়ে আমি (জীব) অনেক সুখ ভোগ করেছি। প্রতিদিন উঠে ওকে রগড়ে রগড়ে ধুয়েছি, কিন্তু সেই দেহই নষ্টভ্রষ্ট হয়ে যাবে আর ওর নামই কেউ নেবে না। শিব-সনক এবং ব্রহ্মাদি জগৎকর্তা আর সহস্রানন শেষনাগ—যাঁরা ত্রিভুবনে দেহধারণ করেছেন, কেউই স্থির হয়ে নেই। পাপপুণ্য এই দুইই (জীবনসখা) আছে। (দেহ নয়)। হে মানব, এটি বুঝে দেখ। কবীর বলেন, পূর্ণপ্রভুর গতি বুঝতে পারে এমন লোকের সংখ্যা বিরল।

(২০)

হঁম ন মরৈঁ মরিহৈ সংসারা।
হঁমকৌ মিলা জিআবনহারা ॥ ধুয়া ॥
সাকত মরহিঁ সন্ত জন জীবহিঁ। ভরি ভরি রাঁম
রসাইন পীবহিঁ ॥১॥

হরি মরিহৈ তৌ হঁমহুঁ মরিহৈ। হরি ন মরৈ হঁম
কাহেকৌ মরিহৈ ॥২॥
কহৈ কবীর মন মনহিঁ মিলাবা। অমর ভত্র সুখসাগর
পাবা ॥৩॥

আমি মরব না, সংসার মরে যাবে; কারণ জীবনদাতা রামকে আমি পেয়ে গেছি। শাক্ত মরে যায়, সন্তগণ অমর হন, কারণ তাঁরা রাম রসায়ণ (জীবনদাত্রী ঔষধি) ছেঁকে পান করেন। হরি যদি মরেন তাহলে আমিও মরব। হরি যদি না মরেন ত আমি কিজন্য মরব? কবীর বলেন, আমি নিজের মন পরমাত্মায় মিলিয়ে দিয়েছি; এইভাবে আমি অমর হয়ে গেছি; কারণ আমি সুখসাগর (পরমাত্মা) পেয়েছি।

(২১)

অব হঁম সকল কুসল করি মাঁনাঁ।
সান্তি ভঈ জব গোবিন্দ জাঁনাঁ॥ ধুয়া।
তন মহিঁ হোতী কোটি উপ্যাধি।
উলটি ভই সুখ সহজ সমাধি ॥১॥
জম তৈঁ উলটি ভয়া হৈ রাম।
দুখ বিনসে সুখ কিয়া বিসরাঁম ॥২॥
বৈরী উলটি ভএ হৈ মীতা।
সাকত উলটি সজন ভএ চীতা ॥৩॥
আপা জাঁনি উলটিলৈ আপ।
তৌ নহিঁ ব্যাপৈ তীন্যুঁ তাপ ॥৪॥

অব মন উলটি সনাতন হুবা।
তব আঁনাঁ জব জীবত মুবা ॥৫॥
কহৈ কবীর সুখ সহজি সমাবউঁ।
আপ ন ডরউঁ ন ঔর ডরাবউঁ ॥৬॥

এখন আমাকে সর্বত্র সুখশান্তি দেখাচ্ছেন, কারণ যখন গোবিন্দকে জেনেছি তখনই শান্ত হয়েছি। দেহে যে কোটি কোটি ব্যাধি ছিল সবই আজ সহজ সমাধির মুখে পরিবর্তিত হল। যম বদ্‌লে গিয়ে রাম হ'লেন, দুঃখ বিনষ্ট হল, সুখে আরাম করলাম। শত্রু মিত্রে পরিণত হল, শাক্ত পরিণত হল সজ্জনে। আত্মস্বরূপকে চিনতে পেরে যে নিজের মনকে পরিবর্তিত করতে পারে (উল্টে দিতে জানে) তার আর ত্রিতাপ জ্বালা হয়না। এখন মন উল্টে দিয়ে অমর হয়ে গেলাম, যখন জীবন-মৃত অবস্থা হল, তখনই একথা বুঝতে পারলাম। কবীর বলেন, আমি সহজ সুখে লীন হয়ে গেলাম, এখন কোনো কিছু থেকেই ভয় পাইনা, আর কাউকে ভয় দেখাইও না। (ভেদ দৃষ্টি দূর হয়ে গেছে)।

এই পদে কবীর মনের সাধনার ভেদ বর্ণনা করেছেন, পদের শেষ দুই পঙক্তিতে সে বিষয়ে পরিষ্কার করে বলেছেন। মনের কাজই হল অহরহ বাইরের দিকে দৌড়নো; তিনি মনকে বিষয়াসক্তি থেকে সরিয়ে এনে অন্তর্মুখী করাকে 'মন-উল্টানো' বলেছেন। উল্টে যাবার পর অর্থাৎ মন উন্মন হলে পর মনে বৃহৎ শক্তির আবির্ভাব হয় এবং সে শক্তি সনাতন হয়ে যায়। এই অবস্থা তখনই হয় যখন কেউ 'জীবন্মৃত' অথবা গীতায়

উল্লিখিত 'স্থিতপ্রজ্ঞ' হতে পারে। গীতায় বলা হয়েছে—

যদা সংহরতে চাইয়ং কূর্মোইঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠাতা।

অর্থাৎ যিনি নিজের ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় থেকে কচ্ছপের অঙ্গের মতো সব দিকে সংকুচিত করে নিতে পারেন তাঁরই বুদ্ধি স্থির হয়েছে ; তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ রূপে পরিচিত হন।

(২২)

রামুরায় চলী বিনাবন মাহো।
ঘর ছোড় জাই জুলাহৈা ॥ ধুয়া ॥
গজ নব গজ দস গজ উনইস কী পুরিয়া এক তনাঈ।
সত সূত্ত দৈ গণ্ড বহত্তরি পাট লাগু অধিকাঈ ॥১॥
গজৈঁ ন মিনিঐ তোলি ন তুলিঐ পহজন সের অঢ়াঈ।
অঢ়াই মৈঁ জে পাব ঘটৈ তৌ করকচ কর ঘরহাঈ ॥২॥
দিন কী বেঠ খসম সোঁ বরকস তাপর লগী তিহাঈ।
ভীংগী পুরিয়া ঘর হী ছঁড়ী চলা জুলাহ রিসাঈ ॥৩॥
ছোছী নলী কাঁম নহিঁ আবৈ লপটি রহী উরঝাঈ।
ছাঁড়ি পসার রাঁম ভজু বউরে কহৈ কবীর সমঝাঈ ॥৪॥

রামু রায় (মায়া) মিহি কাপড় বুনিয়ে আনতে (কাজ করিয়ে নিতে) চলল। কিন্তু জোলা তো ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে, অর্থাৎ মন কর্মজঞ্জালে বিরক্ত হয়ে উঠেছে তার। দেহপ্রপঞ্চ এরকম : নয় গজ (নব নাড়ী) আর দশ গজ (দশ ইন্দ্রিয়ে) এই উনিশ গজী কাপড়ের এক টানা দেওয়া হয়েছে

(দেহ গড়ে উঠেছে)। এই টানা (দেহ) কে গজের মাপ-কাঠিতে মাপা যায় না, দাড়িপাল্লাতে ওজন করা যায় না। (দেহ রচনার রহস্যভেদ করা কঠিন)। এতে আড়াই সের মাড় (আহার্য) লাগে। তাতে পোয়ামাত্র কম পড়লে কাপড়ের দাম কমে যায়—তাতে ঘরে ঝগড়াঝাটি হয়। এখানে এ কথা জানা দরকার যে একসময়ে কোনো কোনো কাপড় ওজন হিসেবে বিক্রি হত। দেহের দিকে দেখতে গেলে এর অর্থ এই ঃ দৈনিক আহার্য মোট আড়াইসের থেকে পোয়া পরিমাণ কম হলে ইন্দ্রিয়গুলি দুর্বল হয়ে পড়ে। প্রচণ্ড খাটলে দিনের শেষে মালিকও কৃপা করেন (সাবধানে সাধন করলে প্রারব্ধ বৃদ্ধি হয়)। তাতেও উপার্জনের তৃতীয়াংশ দিয়ে দিতে হয় (ত্রিতাপ ভোগ করতে হয়)। এই সমস্ত মায়া থেকে বিরক্তিভরে জোলা ঘর ছেড়ে পালাল (দেহযন্ত্রনায় অতিষ্ঠ হয়ে মন মুক্তি সন্ধানে চলল)। শূন্য নলী দিয়ে তো কাপড় বোনা চলে না, কারণ ওটা টানাতে জড়িয়ে গিয়ে আটকে যায় (ফাঁকা মনে কর্ম হয়না সে নিজের মধ্যেই আটকে থাকে)। এজন্য ভেবেচিন্তে কবীর বলছেন, রে পাগ্‌লা, এই দোকান পসার (দেহপ্রপঞ্চ) ছেড়ে দিয়ে রামের ভজনা কর।

(২৩)

রাঁম সুমিরি নর বাবরৈ।
তোরী সদা ন দেহিয়াঁ রে॥ ধুয়া॥
যহু মায়া কহৌ কাঁন কী কাকৈ সংগ লাগী রে।
গুদরী সী উঠি জাইগী চিত্ত চেতি আভাগী রে ॥১॥

সৌনৈঁ কী লংকা বনী ভই ধুর কী ধানী রে।
সোই রাবন কী সাহিবী ছিন মাঁহি বিলাঁনী রে ॥২॥
বারহ জোজন কে বিথৈ চলে ছত্র কী ছহিয়াঁ রে।
সোহ জরিজোধন কহ গএ মিলি মাটী মহিয়াঁ রে ॥৩॥
কহৈ কবীর পুকারি কৈ ইহাঁ কোঈ ন অপনাঁ রে।
যহু জিয়রা চলি জাইগা জস রৈনি কা সপনাঁ রে ॥৪॥

হে পাগল মানব, রামকে স্মরণ কর, কারণ যে দেহের অহঙ্কার তুই করিস্ এই দেহ চিরস্থায়ী নয়। এই সম্পত্তি বলো দেখি কার, আর কার সঙ্গে এ যাবে? বাজারের মতোই এটি ভেঙে যাবে এক সময়। হে অভাগা এ বিষয়ে মনে বিচার করে দেখ। সোনার লঙ্কা তৈরী হয়েছিল, সেও তো ধূলিসাৎ হল; আর রাবণের বড়মানুষীও ক্ষণকালমধ্যে মিলিয়ে গেল। বারো যোজন বিস্তৃত স্থানে বিপুল ঐশ্বর্যের মধ্যে যে ছত্রছায়ায় দুর্যোধন চলাফেরা করতেন তিনিও তো মাটিতে মিশে গিয়ে অদৃশ্য হলেন। কবীর উচ্চৈঃস্বরে বলছেন, যে এখানে কেউই আপনার নয়। এই জীব ঐভাবেই চলে যাবে—যেভাবে রাতের স্বপ্ন মিলিয়ে যায়।

(২৪)

চারিদিন অপনী নৌবতি চলে বজাই।
উত্তানৈঁ খটিয়া গড়িলে মাটিয়া সংগি
ন কছু লৈ জাই ॥ধুয়া॥
দেহরী বৈঠী মেহরী রোবৈ দ্বারৈ লগি সগী মাই।
মরহট লৌঁ সব লোগ কুটুম্ব মিলি হংস অকেলা জাই ॥১॥

বহি সুত বহিবিত্ত পুর পাটন বহুরি ন দেখৈ আই।
কহত কবীর ভজন বিন বন্দে জনম অকারথ জাই ॥২॥

চারদিন নিজের সানাই বাজিয়ে আবার লোকেরা চলে যায়। চিৎ করে খাটের মধ্যে তুলে নিয়ে গিয়ে তাকে মাটিতে কবর দেয়। সঙ্গে কেউ কিছুই নিয়ে যায় না। দরজার চৌকাঠে বসে বউ কাঁদে ; মা দরজা পর্যন্ত যায়, আত্মীয়স্বজন সবে মিলে কবরখানা পর্যন্ত যায়। সবার আগে একা একা শুধু হংস (আত্মা) যায় ; এই পুত্র, এই বিত্ত, এই শহরপাট ফিরে এসে আর দেখতে সে পায়না। কবীর বলছেন, রে বান্দা, ভজন বিনা জন্ম বিফলে চলে যায়।

(২৫)

মন রে মনহিঁ উলটি সমাঁনা।
গুর পরসাদি অকিলি ভঙ্গ অবরৈ নাতরূ
থা বেগাঁনাঁ ॥ ধুয়া ॥
উলটৈ পবন চক্র খটু ভেদে সুরতি সুন্নি অনুরাগী।
আবৈ ন জাই মরৈ নহিঁ জীবৈ তাহি খোজি বৈরাগী ॥১॥
নিয়রৈ দূরি দূরি ফুনি নিয়রৈ জিনি জৈসা করি মাঁনা।
ঔলোতী কা চঢ়া বরেঁডৈ জিনি পীয়া তিনি জাঁনা ॥২॥
তেরী নিরগুণ কথা কবন সৌ কহিঅ হৈ
কোঈ চতুর বিবেকী।
কহৈ কবীর গুর দিয়া পলীতা সো ঝল বিরলৈ দেখী ॥৩॥

মন উল্টে নিয়ে মনে মিলিয়ে গেলাম। গুরুর কৃপায় আমার আরও বুদ্ধি হয়েছে, তা নাহলে আমি এই রহস্য ভেদ করতে পারতাম না। বাতাসকে উল্টে দিয়ে অর্থাৎ নিঃশ্বাস রোধ করে প্রাণায়াম দ্বারা ষট্‌চক্র ভেদ করলাম, তখন মন শূণ্যের দিকে ধাবিত হল অর্থাৎ মনের উন্মনাবস্থা হল। হে বৈরাগী, তাঁরই অন্বেষণ কর, যাঁকে পেলে আসা যাওয়া তথা জীবন-মরণ থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। নিকটে থেকেও সে যে দূরে, আবার দূরে থেকেও সে যে নিকটে—যে যেমন করে তাকে বুঝেছে। চালের জল মারুলের দিকে উঠে যায়; যে এই জল পান করে সেই শুধু তার স্বাদ জানে। অর্থাৎ ঐ স্থিতির আনন্দ তিনিই অনুভব করেন যিনি মন উল্টানোর সাধনা জানেন। তোমার এই নির্গুণ কথা কার কাছে বলব? আছে কি তেমন কোনো কুশলী আর জ্ঞানী? কবীর বলেন, গুরু যে সলতে দিয়েছেন তার আলোর রোশনাই অন্যত্র দেখা যায় না।

(২৬)

মন মোর রহটা রসনাঁ পিউরিয়া।
হরি কৌ নাঁউঁ লৈ কাতি বহুরিয়া॥ ধুয়া॥
চারি খুঁটী দোই চমরথ লাঈঁ।
সহজি রহটবা দিয়ৌ চলাঈ॥১॥
ছৌ মাস তাগা বরিস দিন কুকুরী।
লোগ বোলৈঁ ভল কাতল বপুরী॥২॥
কহৈ কবীর সূত ভল কাতা।
রহটা নহীঁ পরম পদ দাতা॥৩॥

মন আমার চরখা। জিহ্বা তূলা। ওগো নববধূ (জীবাত্মা) তুমি হরিনামের সূতা কেটে নাও (অর্থাৎ হরিনাম জপ কর)। চারটি খুঁটি (অন্তঃকরণ চতুষ্টয়) এবং দুটি চাম-চাকতি (ইড়া-পিঙ্গলা নাড়ী অথবা শ্বাস) লাগিয়ে (বশে এনে) সহজভাবে চরখা চালিয়ে দাও। ছ'মাস সূতো কাটা হল (মন একাগ্র করা হল), আর একবছর ধরে সূতো জড়ালাম (মনকে অন্তর্মুখী করলাম)। তখন লোকে বলল যে বেচারী (জীবাত্মা) ভালো সূতোই কেটেছে (ভালোরূপে নাম সাধনা করেছে)। কবীর বলছেন যে এইভাবে আমি ভালো সূতোই কেটেছি (যথার্থ সাধনা করেছি)। কাজেই, বুঝতে পেরেছি যে এই চরখা সামান্য চরখা নয়, এই চরখা অভীষ্ট দাতা (অর্থাৎ এই মন সাধারণ বস্তু নয়, এই মনই মুক্তি দিতে পারে)।

(২৭)

লোকা তুম জ কহত হো নন্দ কো নন্দন
নন্দ কহো ধুঁ কাকো রে।
ধরনি অকাস দোউ নহিঁ হোতে তব
যহু নন্দ কহাঁ থৈ রে ॥ ধুয়া ॥
লখ চৌরাসী জীঅ জোনি মহিঁ ভ্রমঁত ভ্রমঁত
নন্দ থাকৈ রে।
ভগতি হেতু ঔতার লিয়ৌ হৈ ভাগু
বড়ো বপুরা কৌ রে ॥১॥
জনমৈঁ মরৈ সংকটি আবৈ নাঁব নিরঞ্জন জাকৌ রে।
দাস কবীর কৌ ঠাকুর ওসী জাকৌ মাঈ
ন বাপৌ রে ॥২॥

তোমরা যে বল যে ইনি কৃষ্ণ নন্দ নন্দন, তাহলে সত্যি করে বলতো নন্দ কার পুত্র? কল্পান্তরকালে যখন পৃথিবী ছিল না, আকাশ ছিল না, তখন এই নন্দ কোথায় ছিলেন? যিনি কৃষ্ণ অর্থাৎ পরব্রহ্মের জন্মদান করলেন? চৌরাশী লক্ষ যোনিতে জন্ম নিতে নিতে নন্দ থেমে গেলেন; ভক্তির জন্য তাঁর ঘরে ভগবান অবতার রূপে এলেন—ওই বেচারীর এই বড় ভাগ্য! যিনি জন্মগ্রহণ করেন না, মৃত্যু বরণ করেন না, সংকটে পড়েন না এবং যিনি নিরঞ্জন (নিরাকার) তিনিই কবীরদাসের প্রভু; যাঁর না আছে পিতা, না আছে মাতা।

(২৮)

মোহিঁ বৈরাগ ভয়ৌ।
যহু জিউ আই রে কহঁা গয়ৌ ॥ ধুয়া ॥
আকাসি গগনু পাতালি গগনু হৈ দহ দিসি গগনু রহাইলে।
আনন্দ মুল সদা পুরখোতম ঘট বিনসৈ
গগনু ন জাইলে ॥১॥
পঞ্চ তত্ত মিলি কায়া কীনীঁ তত্ত কহঁা তৈ কীনু রে।
করমবন্ধ তুম জীউ কহত হৌ করমহিঁ কিন জিউ
দীনু রে ॥২॥
হরি মহি তনু হৈ তন মহিঁ হরি হৈ সরব
নিরন্তরি সোই রে।
কহৈ কবীর হরি নাঁউঁ ন ছাঁড়উঁ সহজৈঁ হোই সু
হোই রে ॥৩॥

এই প্রাণ এসে আবার কোথায় মিলিয়ে যায়—এই কথা ভেবে ভেবে আমার সংসারে বিরাগ জন্মাল। আকাশে গগন, পাতালে গগন, এবং দশদিকেই গগন রয়েছে। এই রকমই সেই পুরুষোত্তমও (পরমাত্মা) চিরস্থির আনন্দনিধান স্বরূপ। কলসী ভেঙে যায়, কিন্তু কলসীর ভিতরে যে আকাশ ছিল সে আকাশ অনন্ত আকাশে মিশে যায়। পঞ্চতত্ত্ব মিলে দেহ তৈরী হয়, কিন্তু ভেবে দেখো তত্ত্ব কি দিয়ে তৈরী? তুমি বলছ যে জীব তার কর্মে বাঁধা, কিন্তু ভেবে দেখো জীবকে কর্ম কে দিয়েছে? অর্থাৎ পরমাত্মাই তত্ত্ব রচনা করেছেন এবং তিনিই কর্মের জালও ফেলেছেন। পরমাত্মাতেই দেহ রয়েছে (জীব পরমাত্মাকে আশ্রয় করেই আছে), দেহেতে পরমাত্মা রয়েছেন —ইনিই সর্বত্র অখণ্ডরূপে ব্যাপ্ত। কবীর বলছেন, যা হবার তা হোক, এমন হরির নাম আমি সহজে ছাড়ছি না।

(২৯)

কবীরা বিগরয়ৌ রাঁম দুহাঈ।
তুম্হ জিনি বিগরৌ মেরৈ ভাঈ॥ ধুয়া॥

চন্দন কে ঢিংগ বিরিখ জু ভৈলা। বিগরি বিগরি সো চন্দন হৈলা॥১॥

পারস কৌঁ জে লোহ ছিবৈলা। বিগরি বিগরি সো কঞ্চন হৈলা॥২॥

গঙ্গা মৈঁ জে নীর মিলৈলা। বিগরি বিগরি গঙ্গোদিক হৈলা॥৩॥

কহৈ কবীর জে রাঁম কহৈলা। বিগরি বিগরি
সো রাঁমহি হৈলা ॥৪॥

দোহাই, হে রাম! কবীর তো বিগড়ে গেছে। আরে আমার ভাই, তুমিও আবার বিগড়ে যেওনা। চন্দন গাছের কাছে যে গাছ হয়েছে সে বিগড়ে বিগড়ে চন্দন হয়ে গেছে। যে লোহা পরশমণি ছুঁয়েছে—সে বিগড়ে বিগড়ে সোনা হয়ে গেছে। গঙ্গায় যে জল এসে মিলেছে সেও বিগড়ে বিগড়ে গঙ্গাজল হয়েছে। কবীর বলছেন যে এই ভাবেই যে রাম রাম বলে সে বিগড়ে বিগড়ে রামই হয়ে যায়।

(৩০)

আসন পবন দূরি করি রউরা।
ছাঁড়ি কপট নিত হরি ভজি বৌরা॥ ধুয়া॥
কা সীংগী মুদ্রা চমকাত্রঁ। কা বিভূতি সব
অঙ্গ লগায়েঁ ॥১॥
সো হিন্দু সো মুসলমাঁন। জিসকা দুরুস
রহৈ ঈমাঁন ॥২॥
সো জোগী জো ধরে উনমনী ধ্যাঁন। সো ব্রহ্মাঁ জো
কথৈ ব্রহ্ম গিয়াঁন ॥৩॥
কহৈ কবীর কছু আঁন ন কীজৈ। রাঁম নাঁম জপি
লাহাঁ লীজৈ ॥৪॥

হে যোগী, তোমার আসন প্রাণায়ামের জঞ্জাল দূর কর আর

কপটতা ছেড়ে আরে পাগ্‌লা, নিত্য হরির ভজনা কর। শিঙা আর মুদ্রা দেখিয়ে কি হবে? সারা শরীরে ভস্ম মেখেই বা কি হবে? সেই প্রকৃত হিন্দু আর সেই প্রকৃত মুসলমান যার বিশ্বস্ততা অটুট থাকে। (কারণ, ধর্মমত যাই হোক না কেন মানুষের চরিত্রের শক্তিই আসল শক্তি—চরিত্রই ধর্মের আত্মা-স্বরূপ) যোগী তাঁকেই বলে যিনি একনিষ্ঠভাবে ধ্যান করেন; আর ব্রাহ্মণ তিনিই যাঁর ব্রহ্মজ্ঞান আছে। কবীর বলেন যে আর কিছুই করতে হবে না, কেবল রাম নাম জপ করলেই জীবনের পরমবস্তু লাভ হবে।

(৩১)

সার সুখ পাইঐ রে।
রঙ্গি রবহু আতমাঁরাঁম ॥ ধুয়া ॥
বনহিঁ বসেঁ কা কীজিঐ জো মন নহীঁ তজৈ বিকার।
ঘর বন্ সমসরি জিনি কিয়া তে বিরলা সংসার ॥১॥
কা জটা ভসম লেপন কিএঁ কহা গুফা মৈঁ বাস।
মন জীতেঁ জগ জীতঐ জো বিখিয়া তৌঁ
রহৈঁ উদাস ॥২॥
কাজল দেই সভৈ কোঙ্গ চখি চাহন মাঁহিঁ বিনাঁন।
জিনি লোইন মন মোহিয়া তে লোইন পরবাঁন ॥৩॥
কহৈ কবীর ক্রিয়া ভঙ্গ গুর গ্যাঁন কহাঁ সমঝাই।
হিরদৈ শ্রী হরি ভেটিয়া অব মন অনত ন জাই ॥৪॥

হে প্রাণী, আত্মারামের রঙ্গে তুমিও রঙ্গিলা হও; তাতেই প্রকৃত সুখ পাওয়া যায়। মনের বিকার যদি ছাড়াতে না পারো তবে বনে বাস করেই বা কি করবে? ঘরকে আর বনকে যে সমান জ্ঞান করতে পারে এমন মানুষ সংসারে বিরল। জটা বাড়িয়ে কি হবে, ভস্ম মেখেই বা কি হবে, কি হবে গুহাগহ্বরে লুকিয়ে থেকে? মনকে জয় করতে পারলেই জগৎ জয় করা যায়—যদি কেউ বিষয় থেকে উদাসীন থাকতে পারে। সবাইতো চোখে কাজল পরে থাকে, দেখতে হয়তো বা খাসা দেখায়; কিন্তু আসলে কাজল পরা তাকেই সাজে যার চোখ দেখলে এমনিতেই সবাই মোহিত হয়। কবীর বলেন যে গুরু কৃপা করে আমাকে জ্ঞান দান করলেন তাই আমি হৃদয়ে শ্রীহরির দেখা পেলাম। এখন আমার মন আর কোথায়ও যায় না।

(৩২)

অল্লহ রাম জিউঁ তেরে নাঁঈ।
বন্দে উপরি মিহরি করো মেরে সাঁঈ॥ ধুয়া॥
ক্যা লৈ মুড়ী ভুইঁ সোঁ মারেঁ ক্যা জল দেহ নৃহবাএ।
খুন করৈ মিসকীন কহাবৈ গুনহী রহৈ ছিপাএঁ॥১॥
ক্যা উজু জপ মঞ্জন কীএঁ ক্যা মসীতি সিরু নাএ।
দিল মহিঁ কপট নিবাজ গুজারৈ ক্যা হজ কাবৈ জাএঁ॥২॥
ব্রাঁহ্মন গ্যারসি করৈ চৌবীসোঁ কাজী মহঁ রমজাঁনাঁ।
গ্যারহ মাস কহো কঁ্যু খালি একহি মাঁহিঁ নিয়াঁনাঁ॥৩॥

জৌ রে খুদাই মসীতি বসতু হৈ ঔর মুলুক কিস কেরা।
তীরথি মুরতি রাঁম নিবাসী দুহু মহিঁ কিনহুঁ ন
হেরা ॥৪॥
পূরব দিসা হরী কা বাসা পচ্ছিমি অলহ মুকাঁমাঁ।
দিল মহিঁ খোজি দিলৈ দিলি খোজহু ইহঈ রহীমাঁ
রাঁমা ॥৫॥
জেতে ঔরতি মরদ উপানে সো সব রূপ তুমহারা।
কবীর পুঙ্গরা অলহ রাঁম কা সোই গুর পীর হমারা ॥৬॥

হে আল্লা! হে রাম! আমি তোমার নামেই বেঁচে আছি। হে আমার প্রভু! দাসের প্রতি দয়া কর। বারে বারে মাথা মাটিতে ঠুকেই বা কি হবে, আর জলে দেহটাকে বারে বারে ধুয়েই বা কি হবে? প্রাণী বধ করছ আবার নিজেকে নম্র বলেও জাহির করছ; আসল গুণ তো রয়েছে ভিতরে লুকানো। উজু করেই বা কি হবে; জপ-স্নানেই কি হয় আর মসজিদে গিয়ে মাথা নোয়ালেই বা কি হয়? হৃদয়ে যদি কপটতার নমাজ পড়া হয় তো হজ-কাবাযাত্রায় কি ফল? ব্রাহ্মণ চব্বিশ একাদশী পালন করে আর মোল্লা রমজান মাসে রোজা রাখে। বল-তো সত্যি করে, এগারো মাস একেবারে বাদ দিয়ে এক মাসেই সমস্ত পুণ্যসঞ্চয় হয়ে গেল কি? ভাই, যদি খোদা মসজিদেই শুধু রয়েছেন তাহলে বাকি সমস্ত সংসার কার? হিন্দু মতে রাম তীর্থে আর মূর্তিতে আছেন, কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে কেউই তাঁকে দেখতে পায়নি। পূব দিকে (জগন্নাথপুরীর) হরির আশ্রম আর পশ্চিমে (কাবা) আল্লার

মোকাম ; কিন্তু হে মানব, হৃদয়ে অন্বেষণ কর, হৃদয়ে হৃদয় খোঁজো ; এখানেই আছেন রহিম, এখানেই আছেন রাম— পূর্বে নেই পশ্চিমে নেই। 'হে প্রভু' যত নারী পুরুষের জন্মদান করেছ সব তোমারই রূপ। কবীর আল্লা আর রামের ছেলে— তিনিই আমার গুরু তিনিই আমার পীর।

(৩৩)

মেরী জিভ্যা বিস্নু নৈঁন নারাইন হিরদৈ বসহি গোবিন্দা।
জম দুবার জব লেখা মাঁগৈ তব কা কহসি মুকুন্দা॥ ধুয়া।
তূঁ ব্রাহ্মণ মৈঁ কাসী ক জোলহা চীনহি মোর
গিয়াঁনাঁ।
তৈঁ সব মাগে ভূপতি রাজা মোরৈ রাঁম ধিয়াঁনাঁ॥১॥
পূরব জনম হম ব্রাঁহ্মণ হোতে ওছে করম তপ হীনাঁ।
রাঁম দেব কী সেবা চুকা পকরি জুলাহা কীনৃহাঁ॥২॥
হঁম গোরু তুম গুআর গুসাঁঈ জনম জনম রখবারে।
কবহুঁ ন পার উতারি চরাএহু কৈসে খসক হমারে॥৩॥
ভৌ বূড়ত কছু উপাই করীজৈ জোঁ তরি লঘৈ তীরা।
রাঁম নাঁম জপি ভেরা বাঁধৌ কহৈ উপদেশ কবীরা॥৪॥

আমার জিভেতে আছেন বিষ্ণু, নয়নে আছেন নারায়ণ, হৃদয়ে গোবিন্দ বসবাস করছেন। যম যখন দুয়ারে এসে হিসাবের খাতা দেখতে চাইছে তখন তুই কেন মুকুন্দ মুকুন্দ বলছিস? তুমি ব্রাহ্মণ, আমি কাশীর জোলা, তুমি আমার ধ্যানজ্ঞান জাননা। তুমি তো সংসারী রাজা মহারাজার কাছে ভিক্ষা

চেয়েছে, আমার মন শুধুই রামেতে নিবদ্ধ। পূর্বজন্মে আমি ব্রাহ্মণ ছিলাম—যখন আমার ভাগ্য অপ্রসন্ন হল আমি তপস্যায় হীন হলাম। তারপর রামদেবের সেবাকর্ম্মে আমার গাফিলতি হওয়ায় তিনি আমাকে এই জন্মে জোলা বানিয়ে দিলেন। আমি গরু হলাম আর হে ব্রাহ্মণ, তুমি হলে আমার গোয়ালা আর গোঁসাই বা প্রভু—আমার মতো অজ্ঞানীর তুমি জন্ম-জন্মান্তরের রাখাল। কিন্তু তুমি কখনও আমাকে সীমা পার করে সীমাহীন ক্ষেত্রে চরাওনি অর্থাৎ সব সময় একই ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে রেখে চরিয়েছ—অথবা তোমার উদ্দেশ্য সাধনের পাঠই দিয়েছ; সেই তুমি কেমন করে আমার প্রভু? ভবসাগরে ডুবছ তুমি—তোমাকে একটা উপায় বের করতে হবে যাতে সাঁতার দিয়ে পারের নাগাল পাও। রাম নাম জপ কর, নামের ভেলা বাঁধো, তোমাকে কবীর এই উপদেশই শোনাচ্ছেন।

(৩৪)

পণ্ডিয়া কবন কুমতি তুম লাগে।
বুড়হুগে পরিবার সকল সিউঁ রাঁম ন জপহু ঁ অভাগে॥
ধুয়া॥

বেদ পুরাঁন পঢ়ে কা ক্যা গুন্ খর চন্দন জস ভারা।
রামঁ নাঁম কী গতি নাঁহি জাঁনীঁ কৈসৈ উতরসি পারা॥১॥

জীঅ বধহু সু ধরমু করি থাপুহু অধরম কহহু কত ভাঈ।
আপস কৌঁ মুনিবর করি থাপহু কাকৌ কহৌ কসাঈ॥২॥

মন কে অন্ধে আপি ন বুঝহু কাহি বুঝাবহু ভাই।
মায়া কারনি বিদ্যা বেচহু জনমু অবিরথা জাই ॥৩॥
নারদ বচনু বিআস কহতে হৈঁ সূক কৌ পুছহু জাঈ
কহৈ কবীর রাঁমৈঁ রমি ছুটহু নাঁহিঁ ত বুড়ে ভাঈ ॥৪॥

কেন রে পণ্ডিত, কি কুমতি তোমার হল? হে অভাগা, যদি রাম নাম জপ না কর তাহলে সপরিবারে ডুবে যাবে তুমি! বেদ পুরাণ পাঠই তোমাদের সব চেয়ে ভালো মনে হয়? এ-তো গাধার পিঠে চন্দনের বোঝা চাপানোর মতো! রাম নামের রহস্য ভেদ হলনা তোমার, কেমন করে পরিত্রাণ পাবে? জীবহত্যা করছ আর একেও বলছ ধর্ম; তাহলে বলো-তো ভাই, অধর্মটা কোথায় আছে? একজন অপরজনকে মুনিশ্রেষ্ঠ বলে মানছ—তাহলে কসাই বলব কাকে? জ্ঞানান্ধ হে মানব, তুমি নিজে-ত কিছুই জাননা, অপরকে কি শেখাও বোঝাও? ধন সঞ্চয়ের জন্য বিদ্যা বিক্রী করছ, এ-রকমভাবে জীবন অনর্থক বয়ে যাচ্ছে। নারদের বচন সত্য জেনে ব্যাসদেবও বলেছিলেন, শুকদেবের কাছে গিয়ে শোধাও (যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয়)। কবীরও সে-কথাই বলছেন যে রামের ভজনা করতে করতেই উদ্ধার হতে পারবে তুমি—না হলে ভাই এখনতো ডুবেই আছ!

(৩৫)

কহু পণ্ডিত সূচা কবন ঠাঁউঁ।
জহাঁ বৈসি হউঁ ভোজনু খাঁউঁ ॥ ধুয়া ॥

মাতা জুঠী পিতা ভী জুঠা জুঠে হী ফল লাগে।
আবাহিঁ জুঠে জাহিঁ ভী জুঠে জুঠে মরহিঁ অভাগে ॥১॥
অগিনি ভী জুঠী পাঁনীঁ জুঠা জুঠে বৈসি পকায়া।
জুঠী করছী অন্ন পরোসা জুঠে জুঠা খায়া ॥২॥
গোবরূ জুঠা চউকা জুঠা জুঠে জীনোঁ কারা।
কহৈ কবীর তেঈ জন সূচে জে হরি ভজি তজহিঁ-
বিকারা ॥৩॥

বল-তো পণ্ডিত, কোন স্থানটি শুচিশুদ্ধ, যেখানে বসে আমি ভোজন করতে পারি? (সংসারে তো শুচি কিছুই নেই) মাতা অশুচি, পিতাও অশুচি, যে-সকল সন্তান সন্ততি হয় তারাও অশুচি। আসা অশুচি, যাওয়াও অশুচি, অভাগাদের মরণও অশুচি। আগুন অশুচি, জল অশুচি, অশুচি স্থানে বসে রান্নাও করা হয়। অশুচি হাত দিয়ে ভাত পরিবেশন করা হয় এবং অশুচিই অশুচিকে খায়। গোবর অশুচি, রসুইঘর অশুচি, রসুইঘরের সীমারেখাও অশুচি। কবীর বলছেন, যে জন হরিভজন করে নির্বিকার হয়ে যায় সেই কেবল শুচি।

(৩৬)

আউংগা ন জাউংগা মরূংগা ন জিউংগা।
গুর কে সাথি অমীঁ রস পিউংগা ॥ ধুয়া ॥
কোঈ ফেরৈ মালা কোঈ ফেরৈ তসবী। দেখৌ রে
লোগ দোনৌঁ কসবী ॥১॥

কোই জাবৈ মক্কে কোই জাবৈ কাসী। দোউ কে গলি
পরি গই পাসী ॥২॥
কহত কবীর সূনোঁ নর লোই। হঁম ন কিসী কে ন
হঁমরা কোঈ ॥৩॥

আসবনা, যাবনা, এবং মরবনা, বাঁচবনা (আসা-যাওয়া তথা জীবন-মরনের চক্র থেকে মুক্ত থাকব); গুরুর কাছ থেকে ভক্তির অমৃত রস পান করব। কেউ মালা টপকায়, কেউ তস্‌বী ফেরায়; কিন্তু হে মানব, দেখো, এই দুইই পেশামাত্র। কেউ যায় মক্কা, কেউ যায় কাশী; কিন্তু উভয়েরই গলায় বাসনার ফাঁসি। কবীর বলছেন, হে মানবগণ, শোনো, আমি কারও নই, আমারও কেউ নয় (অর্থাৎ সংসারে কেউ কারও নয়—এ-ই হল আসল কথা)।

(৩৭)

কোঁন মরৈ জনমৈঁ আঈ।
স্বরগ নরক কৌনৈঁ পাঈ॥ ধুয়া॥
পঞ্চ তত অবিগত তৈঁ উৎপনা একৈঁ কিয়া নিবাসা।
বিছরেঁ তত ফির সহজি সমাঁনাঁ রেখ রহী নহিঁ
আসা ॥১॥
জব মৈঁ কুম্ভ কুম্ভ মৈঁ জল হৈ বাহরি ভীতরি পাঁনীঁ।
ফুটা কুম্ভ জল জলহি সমাঁনাঁ যহু তত কথৌ
গিয়াঁনীঁ ॥২॥

আদৈ গগনাঁ অঁতৈ গগনাঁ মধ্যে গগনাঁ ভাঈ।
কহৈ কবীর করম কিস লাগৈ ঝুটী সঁক উপাঈ ॥৩॥

কে মরছে, কে ফিরে এসে জন্ম নিচ্ছে? স্বর্গ নরকের সুখদুঃখই বা কে ভোগ করছে? অবিগত ব্রহ্ম থেকে পঞ্চতত্ত্ব এসেছে। সেই একই এই সকলের মধ্যে রয়েছেন। তত্ত্ব থেকে বিচ্যুত হলে আত্মা আবার সহজ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সেখানে না আছে কোনো সীমারেখা, না আছে কোনো আশা বা দিশা। জলেতে কলসী আছে, কলসীতে জল আছে —এর বাইরে ভিতরে জল আর জল। কলসী ভেঙে গেলে পর কলসীর জল বাইরের জলের সঙ্গে মিশে যায়—এই তত্ত্ব কিছুটা উপলব্ধি করে হে জ্ঞানী, তবে বলো। আরে ভাই, যেখানে আদিতে আকাশ, মধ্যেও আকাশ এবং অন্তেও আকাশ সেখানে আবার কর্মের স্থান কোথায়? কর্ম-ভোগের কথা ভেবে যে-ত্রাসের সঞ্চার হয়, এটা শুধু শুধুই হয়—কবীর এ-কথাই বলেন।

(৩৮)

কাহে মেরে বাঁমহন হরি ন কহহি।
রাঁম ন বোলহি পাঁড়ে দোজক ভরহি ॥ ধুয়া ॥
জিহিঁ মুখ বেদ গাইত্রী উচরৈ সো কূ্যঁ বাঁমহন
বিসরূ করৈ।
জাকৈ পাইঁ জগত সভ লাগৈ সো পণ্ডিত জিউঘাত
করৈ ॥১॥

আপন ঊঁচ নীচ ঘরি ভোজন্তু ঘনী করম করি উদরু
ভরহি ।
গ্রহন অমাবস রূচি রূচি মাঁগহি কর দীপকু লৈ কূপ
পরহি ॥২॥
তু বাঁহ্মন মৈঁ কাসীক জুলহা মোহিঁ তোহিঁ বরাবরী
কৈসে কৈ বনহি ।
কহৈ কবীর হঁম রাঁম লগি উবরে বেদু ভরোসৈ পাঁড়ে
ডুবি মরহি ॥৩॥

হে আমার ব্রাহ্মণ, তুই কেন হরির নাম করছিস্‌না ? রাম বলছিস না, হে পাণ্ডে, তুই নরক ভুগছিস্‌। যার মুখ দিয়ে বেদ তথা গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারিত হয়, সেই ব্রাহ্মণ এমন ভুল করে ? যার পায়ে সারা সংসার লুটায় সেই পণ্ডিত জীবহত্যা করে। জন্মে উচ্চ হয়ে নীচঘরে খায়, নীচ কাজ করে পেট ভরে। গ্রহণ আর অমাবস্যার কালে মন দিয়ে ভিক্ষা মাগে। এইভাবে হাতে প্রদীপ থাকতেও কূপের ভিতর পড়ে। তুমি ব্রাহ্মণ আর আমি কাশীর জোলা ; তোমার আমার মিল কি করে হবে? কবীর বলেন—আমি তো রামের শরণ নিয়ে বেঁচেছি, কিন্তু হে পাণ্ডে, তুই বেদের উপর নির্ভর করে ডুবে মরছিস্‌।

(৩৯)

হরি বিন ভরমি বিগুচে গদা।
জাপহিঁ জাউঁ আপু ছুটকাবন তে বাঁধে বহু
ফন্দা ॥ ধুয়া ॥

জোসী কহহিঁ জোগু ভল মীঠা ঔর ন দূজা ভাই।
লুঞ্চিত মুণ্ডিত মোনি জটাধর এহি কহহিঁ সিধি
পাই ॥১॥
পণ্ডিত গুনীঁ সূর কবিদাতা এহি কহহিঁ বড় হঁমহীঁ।
জহাঁতে উপজে তহঁঈ সমীনেঁ হরিপদ বিসরা জবহিঁ ॥২॥
তজি বাবৈ দাহিনৈঁ বিকারা হরিপদ দিঢ় করি পহিত্র।
কহৈ কবীর সুংশৈ গুড়খায়া পূছেঁ তৈঁ ক্যা কহিত্র ॥৩।

হরিভক্তি বিনা অশুচি জীব ভ্রম ও বিপত্তিতে পড়ল আর বিনষ্ট হল। যাঁরই কাছে নিজের মুক্তির জন্য যাইনা কেন দেখতে পাই যে তিনিই স্বয়ং সংসারের নানা বন্ধনে আবদ্ধ। যোগী বলেন, 'যোগই মধুর ভাই, আর কিছু নয়'। লুঞ্চিত, মুণ্ডিত, মৌনী, জটাধারী সবাই বলেন, 'সিদ্ধিলাভ করে ফেলেছি। পণ্ডিত, কলাকার, বীর, কবি এবং দাতা—এঁরা প্রত্যেকে বলেন, "আমিই শ্রেষ্ঠ"। কিন্তু হরিভক্তি বিনা ওরা যেভাবে বাড়ছে—সে ভাবেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বিকারকে দুই ধারে ছেড়ে দিয়ে ভক্তিভাবকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে (এদিক ওদিক না তাকিয়ে সহজ পথটি আয়ত্ত করা দরকার)। কবীর বলছেন সহজ অবস্থায় যে আনন্দলাভ হয় তা মুখ ফুটে কেউ বলতে পারেনা—যেমন বোবা গুড় খেলেও বলতে পারেনা যে আমি গুড় খেয়েছি। বোবাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করলে সে কি উত্তর দিতে পারে? তেমনি পারেনা ভক্তিভাবের সাধক তাঁর আনন্দের কথা অপরকে জানাতে। বলার উদ্দেশ্য এই যে ভক্তিরসের আস্বাদন কেবল অনুভবযোগ্য, ভাষায় তা অবর্ণনীয়।

(৪০)

লোকা তুম হো মতি কে ভোরা।
জউ কাসী তনু তজহি কবীরা তৌ রাঁমহিঁ কৌঁন
নিহোরা ॥ ১॥
জো জন ভাউ ভগতি কছু জাঁনৈঁ তাকৌ অচরজু
কাহো।
জৈসেঁ জল জলহীঁ ঢুরি মিলিঔ ত্যোঁ ঢুরি মিল্যো
জুবাহ্নে ॥২॥
কহৈ কবীর সুনহু রে লোঈ ভরমি ন ভুলহু কোই।
ক্যা কাসী ক্যা মগহর উখর হ্রিদৈ রাঁম জৌ হোঈ ॥৩॥

হে মানব, তোমার বড়ই মতিভ্রম। হিন্দুদের বিশ্বাসে ভর করে যদি কবীর কাশীতে লোকান্তরিত হন এবং তাতেই তাঁর মুক্তিলাভ হয়, তাহলে রামের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায় কিসে? যে সেবক ভাবভক্তির রহস্য কিছু জানে তারপক্ষে রামময় হয়ে যাওয়া কি খুব একটা বিস্ময়ের বিষয়? জল যেমন গড়িয়ে গড়িয়ে গিয়ে জলাশয়ে মিলিয়ে যায়, তেমনি করেই জোলা কবীরও তাঁর প্রভু রামের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন। কবীর বলছেন, হে মানব, শোনো, কোনো ভুলেই ভুলবে না। যদি হৃদয়ে রাম থাকেন তাহলে যে কাশী সেই মগহর—দুইয়ে কোনো ভেদ নেই।

বিশেষার্থ—কবীর নিজের জীবনের অন্তিমকালে কোনো না কোনো কারণে কাশী ছেড়ে মগহরে চলে গিয়েছিলেন। লোকসমাজে এক অন্ধবিশ্বাস ছিল যে মগহরে মরলে মানুষের

মুক্তিলাভ হয়না। এই সংস্কারবশে 'মগহরে যে মরে গাধারূপ ধরে' এই প্রবচনের উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু কবীর বলছেন যে যদি কাশীতে দেহত্যাগ করলেই মুক্তিলাভ হয় তো রাম-ভজনের মাহাত্ম্য কোথায় থাকে! মোটের উপর রামের প্রতি ভক্তিভাব হওয়া চাই—তারপর যার ইচ্ছে কাশীতে মরুক, যার ইচ্ছে মগহরে মরুক, তাতে মোক্ষলাভ অবশ্যই হবে। ভক্তি-শাস্ত্রে কবীরের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা ছিল। ভক্তির মাহাত্ম্য প্রদর্শনের জন্যই কবীর লোকসমাজে এই আদর্শ রেখে গেলেন যে অবজ্ঞাত জোলা পরিবারে প্রতিপালিত হয়ে এবং মগহরের ন্যায় অপবিত্র স্থানে দেহত্যাগ করেও ভক্তির শাক্ততে কবীর ভবসাগর থেকে মুক্তিলাভ করতে পেরেছিলেন।

রমৈনী

(১)

পহিলে মন মৈঁ সুমিরো সোঈ।
তা সম তুলে অবর নহিঁ কোঈ॥
কোঈন পূজে বাসো পাঁনাঁ।
আদি অন্তি বো কিন্হুঁ ন জানাঁ॥
রূপ অরূপ ন আবৈ বোলা।
হরু গরু কছু জাই ন তোলা॥
ভূখ ন ত্রিখা ধূপ নহিঁ ছাঁহীঁ।
দুখ সুখ রহিত রহে সব মাঁহীঁ॥
অবিগত অপরংপার ব্রহ্ম, গ্যাঁন রূপ সব ঠাঁম।
বহু বিচার কর দেখিয়া, কোঈ ন সারিখ রাঁম॥

প্রথমেই মনে সেই পরমাত্মাকে স্মরণ কর, তাঁর সমপর্যায়ের আর কেউ আছেন ব'লে জানিনা। তিনি অপার আর তাঁর আদি অন্ত কেউ জানেনা। তিনি সাকার কিংবা নিরাকার সে কথা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তিনি হাল্কা অথবা ভারী—তাও নিরূপণ করা যায় না। তাঁর ক্ষিধে নেই, তৃষ্ণা নেই; তাঁর রোদ নেই, ছায়া নেই; তিনি সুখ দুখের অতীত এবং সকল বস্তুতেই বিরাজমান। তিনি অবিগত এবং অনন্ত, তিনি জ্ঞানস্বরূপ এবং তাঁর গতি সর্বত্র। বহু বিচার করে আমি দেখলাম—রামের সমান কেউ নেই।

(২)

তেহি সাহিবকে লাগৌ সাথা।

দুখ সুখ মেটিকৈ রছহু সনাথা॥

না জসরথ ঘরি উতরি আবা।

না লংকা কা রাবসতাবা॥

দেব কোখি ন অবতরি আবা।

না জসবৈ লৈ গোদ খিলাবা॥

না বো গ্বালন কৈ সঙ্গি ফিরিয়া।

গোবরধন নৈ না কর ধরিয়া॥

বাবন হোই নহীঁ বলি ছলিয়া।

ধরনীঁ বেদ লৈ ন উধরিয়া॥

গণ্ডক সালিগরাম ন কোলা।

মচ্ছ কচ্ছ হোই জলহি ন ডোলা॥

বদ্রী বসি ধ্যান নহিঁ লাবা।

পরসরাম হৈ খত্রী ন সতাবা॥

দ্বারাবতী সরীর ন ছাঁড়া।

জগন্নাথ লৈ পিণ্ড গাড়া॥

কহৈ কবীর বিচারি করি, এ উলে ব্যোহার।

যাহতৈঁ জো অগম হৈ, সো বরতি রহা সংসার॥

সেই প্রভুর সঙ্গে যোগযুক্ত হও আর নিজের সুখদুখ মিটিয়ে নিয়ে সনাথ হও। সেই প্রভু তো দশরথের ঘরে অবতাররূপে

আসেননি। তিনি তো লঙ্কার রাজাকেও মারেননি। দেবকীর গর্ভে অবতাররূপে তাঁর জন্ম হয়নি, যশোদা তাঁকে কোলে নিয়ে খাওয়ায়নি। তিনি গোয়ালাদের সঙ্গে বনে বনে ঘোরেননি, আর হাতে তিনি গোবর্দ্ধনও ধারণ করেননি। বামন হয়ে বলিকে প্রবঞ্চিত করেননি। পৃথিবী আর বেদকে নিয়ে তাকে উদ্ধারও করেননি (বরাহাবতারে)। গণ্ডক নদীতে শালগ্রাম হয়ে আনন্দে তিনি নৃত্য করেননি, মৎস্য অথবা কচ্ছপরূপে তিনি জলেও সাঁতার কাটেননি। বদরীনাথধামে বসে তপস্যা তিনি করেননি; আর পরশুরাম রূপ নিয়ে ক্ষত্রিয়দের মারেননি। দ্বারাবতীতে তিনি দেহত্যাগ করেননি, জগন্নাথপুরীতে তাঁর পিণ্ডও পড়েনি। কবীর বিচার করে বলেছেন, এ সমস্তই পল্লবগ্রাহী, ব্যর্থকামের ব্যবহার। এ-সবের চেয়ে যিনি অগম্য তিনিই সারাজগতে বিরাজমান হয়ে আছেন।

(৩)

জিনি কুলমাঁ কলি মাঁহিঁ পঢ়াবা।
কুদরতি খোজি তিনহুঁ নহিঁ পাবা
করম করীম ভএ করতুতা।
বেদ কুরাঁন ভএ দোউ রীতা॥
কিরতিম সো। জু গরভ অবতরিয়া।
কিরতিম সো জো নাঁমহিঁ ধরিয়া॥
কিরতিম সুন্নতি ঔর জনেউ।
হিন্দু তুরুক ন জাঁনৈঁ ভেউ॥

মন মুসলে কী জুগতি ন জাঁনৈঁ ।
মতি ভুলানি দুই দীন বখাঁনৈঁ ॥
পাঁনীঁ পবন সংজোহ করি, কীরা হৈ উৎপাতি ।
সুন্নি মৈঁ সবদ সমাইগা, তব কাসনি কহিঐ জাতি ॥

যিনি কলিযুগে কলমা পড়িয়েছেন ; সেই মুহম্মদও ঈশ্বরের শক্তির সন্ধান পাননি। ঈশ্বরের কৃপাতেই সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। বেদ-কোরাণ দুইই আসলে দুটি পদ্ধতিমাত্র (অর্থাৎ কবীরের কর্মই হল মূল কথা ; বেদ কোরাণের অপ্রয়োজনীয় প্রসঙ্গের অবতারণা নিরর্থক। কারণ এই যে বেদ আর কোরাণের দোহাই দিয়ে বহু কৃত্রিম আচার-আচরণ গড়ে উঠেছে)। যিনি গর্ভে অবতার ধারণ করেছেন, তিনি কৃত্রিম ; যাঁর নাম করা হয়েছে তিনিও কৃত্রিম। সুন্নত এবং উপনয়ণ—এই দুইও কৃত্রিম। হিন্দু-মুসলমান দুইই রহস্যের কথা জানতনা। মনের সমস্যা সমাধানের যুক্তি জানতনা ; ওদের মতিভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিল, যা থেকে দুই ধর্মের কল্পনা করল। জল আর বায়ুর মিলন থেকেই জীবের উৎপত্তি হয়। অন্তিমকালে যখন শূন্যেতে শব্দ মিলিয়ে যায় তখন কি দিয়ে জাত জিজ্ঞাসা করা যায় ? অর্থাৎ তখন সকল জাতিরই ভেদ-ভাব আপনা থেকেই দূর হয়ে যায়।

কলমা—মুস্লিম ধর্মের মূল মন্ত্রস্বরূপ একটি বাক্য :
"লা ইলাহ ইল্লিল্লাহ মুহম্মদরসুল্লিল্লাহ"

(৪)

পণ্ডিত ভূলে পঢ়ি গুনি বেদা। আপু আপনপৌ
জাঁন ন ভেদা ॥

সংঝা তরপন অরু খট করমাঁ। লাগি রহে ইনকে
আসরমাঁ॥
গইত্রী জুগ চারি পঢ়াই। পুছহু জাই মুকুতি কিন পাই॥
ঔর কে ছুঁএ লেত হৈ সীঞ্চা। ইনতেঁ কহহু কবন
হৈ নীচা॥
অতিগুণ গরব করৈঁ অধিকাই। অধিকৈ গরবি ন
হোই ভলাই॥
জাসু নাম হৈ গরব প্রহারী। সো কস গরবহিঁ
সকৈ সহারী॥
কুল অভিমান বিচার ত্যজি, খোজো পদ নিরবান।
অঙ্কুর বীজ নসাইগা, তব মিলৈ বিদেহী থান॥

ব্রাহ্মণ বেদ পড়ে শুনে ব্যর্থ হল—নিজের রহস্য নিজেই জানতে পারলনা। সন্ধ্যা তর্পন ও ষটকর্ম—এই সমস্ত তার আশ্রমের ব্যাপার। চার যুগ ধরেই গায়ত্রী পড়াচ্ছেন; তাঁর কাছে গিয়ে একটু শোধাও না, এ দিয়ে মুক্তি কে পেয়েছে? ছুঁয়ে দিলে তিনি স্নান করেন; কিন্তু বলতো, তাঁর চেয়ে নীচ কে? তাঁর বেশি গুণ আছে বলে অহঙ্কার করে থাকেন; কিন্তু বেশি অহঙ্কারে ভালো হয় না; কারণ যাঁর নাম দর্পহারী তিনি সেই পরমাত্মা কেমন করে অহঙ্কার সহ্য করবেন? কাজেই কুল-অভিমান, আচার-বিচার বর্জন করে মোক্ষপদ অন্বেষণ কর। যখন অঙ্কুরের সঙ্গে বীজ নষ্ট হয়ে যায় (বাসনা শেষ হয়) তখনই মোক্ষলাভ হয়।

(৫)

অব গহি রাঁম নাঁম অবিনাসী। হরি তজি জনি
কতহুঁ কৈ জাসী।
জহাঁ জাহি তহাঁ হোহি পতঙ্গা। অব জিনি জরসি
সমুঝি বিখ সঙ্গা॥
চোখা রাঁম নাঁম মনি লীনহাঁ। ভ্রিংগী কীট ভিন্ন
নহিঁ কীনহাঁ॥
ভৌসাগর অতি বার ন পারা। তিহিঁ তিরিবে কা
করহু বিচারা॥
মনি ভাবৈ অতি লহরি বিকারা। নহিঁ গমি সূঝৈ
বার ন পারা॥
ভৌসাগর অথাহ জল, তামৈঁ রোহিথ রাঁম অধার।
কহৈ কবীর হরি সরন গহু, তব গোবছ খুর বিস্তার॥

এখন অবিনাশী রামনাম আশ্রয় কর। হরিকে ছেড়ে আর কারও কাছে যেয়োনা। যেখানেই যাবে পতঙ্গ হবে আর শেষে পুড়ে মরবে। এখন একটু বুঝে দেখ, বিষয় বাসনার আগুনে পুড়ে মরোনা। সর্বোত্তম রাম নাম স্মরণ করলে ভৃঙ্গে ও পতঙ্গে তফাৎ থাকে না। ভবসাগর বিশাল, এর কূলকিনারা নেই; পার হবার উপায় চিন্তা কর। মনের বিকারের তরঙ্গ অতি মনোহর; এরও আদি-অন্ত খুঁজে পায়না কেউ। এই ভবসাগরে অথৈ জল, এতে রামরূপী নৌকোই অবলম্বন। কবীর বলছেন, হরিকে আশ্রয় কর, তাহলে এই অথৈ সমুদ্রকে বাছুরের খুরের মতোই ক্ষুদ্র মনে হবে।

সাখী

রাঁম নাঁম কৈ পঁটতরৈ, দেবে কৌঁ কছু নাঁহিঁ।
ক্যা লৈ গুর সন্তোখিএ, হৌঁস রহী মন মাঁহিঁ ॥১॥

সতগুর কী মহিমাঁ অনন্ত, অনন্ত কিয়া উপগার।
লোচন অনন্ত উঘারিয়া, অনন্ত দিখাবনহার ॥২॥

চকঈ বিছুরী রৈঁনি কী, আই মিলৈ পরভাতি।
জে নর বিছুরে রাঁম সোঁ, তে দিন মিলে ন রাতি ॥৩॥

বিরহা বিরহা মতি কহৌ, বিরহা হৈ সুলতাঁন।
জিহি ঘট বিরহ ন সঞ্চরৈ, সো ঘট সদা মসাঁন ॥৪॥

অঁখিয়ন তৌ ঝাঁঈ পরী, পন্থ নিহারি নিহারি।
জিভ্যা মৈঁ ছালা পরা, রাঁম পুকারি পুকারি ॥৫॥

নৈঁনাঁ নীঝর লাইয়া, রহট বহৈ নিস ঘাঁম।
পপিহা জ্যোঁ পিউ পিউ করৌ, কঁব রে মিলহুগে
রাঁম ॥৬॥

সোঈ আঁসু সাজনাঁ, সোঈ লোগ বিড়াঁহিঁ।
জো লোইন লোহী চুবৈঁ, তৌ জাঁনৌঁ হেতু
হিয়াঁহিঁ ॥৭॥

কবীর সূতা ক্যা করৈ, উঠি কিন রোবৈ দুকখ।
জাকা বাসা গোর মৈঁ, সো কুঁয় সোবৈ সুকখ ॥৮॥

তূঁ তূঁ করতা তূঁ ভয়া, মুঝমৈঁ রহী ন হূঁ।
বারী তেরে নাঁউঁ পরি, জিত দেখৌঁ তিত তুঁ ॥৯॥

জাঁন ভগত কা নিত মরন, অনজাঁনেঁ কা রাজ।
সর অপসর সমঝৈঁ নহীঁ, পেট ভরন সোঁ কাজ ॥১০॥

ভগত হজারী কাপড়া, তামৈঁ মল ন সমাই।
সাকত কালী কামরী, ভাবৈ তহাঁ বিছাই ॥১১॥

ঐসা কোঈ নাঁ মিলৈ, জাসীঁ রহিএ লাগি।
সব জগ জরতা দেখিয়া, অপনীঁ অপনীঁ আগি ॥১২॥

সারা সূরা বহু মিলৈঁ খাইল মিলৈ ন কোই।
খাইল কৌঁ খাইল মিলৈঁ, তো রাঁম ভগতি দিঢ়
হোই ॥১৩॥

হঁম ঘর জালা আপনাঁ, লিএ মুরাড়া হাথি।
অব ঘর জালৌঁ তাসকা, জো চলৈ হঁমারে সাথি ॥১৪॥

মেরা মুঝমৈঁ কিছু নহীঁ, জো কিছু হৈ সো তেরা।
তেরা তুঝকোঁ সোঁপতাঁ, ক্যা লাগৈ মেরা ॥১৫॥

কস্তূরী কুণ্ডলি বসৈ, ম্রিগ ঢূঁঢ়ৈ বন মাঁহিঁ।
ঐসে ঘটি ঘটি রাঁম হৈ, দুনিয়া দেখৈ নাঁহি ॥১৬॥

হেরত হেরত হে সখী, রহা কবীর হিরাই।
বুঁদ সমাঁনীঁ সমুদ মৈঁ, সো কত হেরী জাই ॥১৭॥

তন ভীতর মন মাঁনিয়া, বাহরি কতহু ন জাই।
জ্বালা তৈঁ ফিরি জল ভয়া, বুঝী বলঁতী লাই ॥১৮॥
কবীর সবদ সরীর মৈঁ, বিন গুণ বাজৈ তাঁতি।
বাহরি ভীতরি রমি রহা, তাতৈঁ ছুটি ভরাঁতি ॥১৯॥
গঙ্গ জমুন কে অন্তরৈ, সহজ সুন্নি লৌঁ ঘাট।
তহাঁ কবীরা মঠ রচা মুনিজন জোবৈঁ বাট ॥২০॥
নৈঁনাঁ অন্তরি আব তুঁ, জ্যোঁ হৌঁ নৈঁন ঝঁপেউঁ।
নাঁ হোঁ দেখোঁ ঔর কোঁ, নাঁ তুঝ দেখন দেউঁ ॥২১॥
দোজগ তৌ হঁম অঁগিয়া যহু ডর নাঁহীঁ মুঝ।
ভিস্তি ন মেরৈ চাহিএ, বাঝ পিয়ারে তুজ্‌ঝ ॥২২॥
হরি রস পীয়া জাঁনিএ, জ উতরৈ নাঁহিঁ খুসারি।
মৈমঁতা ঘুমত ফিরৈঁ, নাঁহিঁ তন কী সারি ॥২৩॥
প্রেম ন বারী উপজৈ, প্রেম ন হাটি বিকাই।
রাজা পরজা জিহিঁ রুচৈ, সীস দেই লৈঁ জাই ॥২৪॥
কবীর নৌবতি আপনীঁ, দিন দস লেহু বজাই।
যহু পুর পট্টন যহু গলী, বহুরি ন দেখহু আই ॥২৫॥
কবীর ধূরি সকেলি কে, পুড়িয়া বন্ধী এহ।
দিবস চারি কা পেখনাঁ, অঁতি খেহ কী খেহ ॥২৬॥
মানুষ জনম দুলঁভ হৈ, হোই ন বারংবার।
পাকা ফল জো গিরি পরা, বহুরি ন লাগৈ ডার ॥২৭॥

কবীর গরব ন কীজিঐ, কাল গহে কর কেস।
নাঁ জানেঁ কহঁ মাঁরিহৈ, কৈ ঘর কৈ পরদেস ॥২৮॥
কবীর মন্দির লাখকা, জড়িয়া হীরৈ লালি।
দিবস চারিকা পেখনাঁ বিনসি জাইগা কালহি ॥২৯॥
উজড় খেড়ে ঠীকরী, গঢ়ি গঢ়ি গত্র কুম্‌হার।
রাবন সরিখা চলি গয়া, লঙ্কা কা সিকদার ॥৩০॥
আজি কি কাল্‌হি কি পচে দিব, জঙ্গলি হোইগা বাস।
উপরি উপরি ফিরহিঁগে, ঢোর চরঁতে ঘাস ॥৩১॥
জ্যোঁ কোরী রেজা বুনৈঁ, নেরা আবৈ ছোরি।
ঐসা লেখা মীচ কা, দৌরি সকৈ তৌ দৌরি ॥৩২॥
কবীর হদকে জীব সোঁ, হিত করি মুখাঁ ন বোলি।
জে রাচে বেহদ্দ সোঁ, তিনসোঁ অন্তর খোলি ॥৩৩॥
কহা চুনাবৈ মৈড়িয়া, চুনাঁ মাটী নাই।
মীচ সুনৈঁগী পাঁপিনীঁ, উদারৈগী আই ॥৩৪॥
কবীর যন্ত্র ন বাজঈ, টুটি গত্র সব তার।
যন্ত্র বিচারা ক্যা করৈ, চলে বজাবনহার ॥৩৫॥
চাকী চলতী দেখিকৈ, দিয়া কবীরা রোই।
দোই পট ভীতর আইকৈ, সালিম গয়া ন কোই ॥৩৬॥
হে মতিহীঁনীঁ মাছরী, ঝীবর মেলা জাল
ডাবরিয়াঁ ছুটৈ নহীঁ, সকৈ ত সমুন্দ সম্‌হালি ॥৩৭॥

কহা চুনাবৈ মৈড়িয়াঁ, লম্বী ভীতি উসারি।
ঘর তৌ সাঢ়ে তীনি হথ, ঘনাঁ ত পৌনৈঁ চারি ॥৩৮॥
বারী বারী আপনীঁ, চলে পিয়ারে মীত।
তেরী বারী জীয়রা, তেরী আবৈ নীত ॥৩৯॥
পাঁনা কেবা বুদবুদা, অস মানুস কী জাতি।
দেখত হী ছিপি জাইংগে, জ্যোঁ তারে পরভাতি ॥৪০॥
রোবনহারে ভী মুএ, মুএ জলাবনহার।
হা হা করতে তে মুএ, কাসোঁ করোঁ পুকার ॥৪১॥
পন্থী উভা পন্থ সিরি, বসুচা বাঁধা পুঠি
মরনাঁ মুঁহ আপৈ খড়া, জীবন কা সব ঝুঠি ॥৪২॥
জিনি হঁম জাএতে মুএ, হঁম ভী চালনহার।
হঁমরৈ পাঁছে পুঙ্গরা, তিন ভী বাঁন্ধা ভার ॥৪৩॥
কবীর যহু জগ কছু নহীঁ, খিনখারা খিন মীঠ।
কাল্হি অনহজা মৈড়িয়াঁ, আজু মসাঁনাঁ দীঠ ॥৪৪॥
বেটা জাএ ক্যা হুয়া, কহাঁ বজাবৈ থাম।
আবন জাবন হৈ রহা, জ্যোঁ কীড়ী কা নাল ॥৪৫॥
রাঁম পদারথ পাই করি, কবিরা গাঁঠি ন খোলি।
নহিঁ পটন নহিঁ পারিখু, নহিঁ গাহক নহিঁ নোলি ॥৪৬॥
হীরা তহাঁ ন খোলিএ, জহঁ কুঁজড়ন কী হাটি।
সহজে গাঁঠী বাঁধিকৈ, লগিএ অপনী বাটি ॥৪৭॥

মরতাঁ মরতাঁ জগ মুবা, মুবৈ ন জানাঁ কোই।
দাস কবীরা যোঁ মুবা, জ্যোঁ বহুরিন ন মরনাঁ
হোই ॥৪৮॥

কবীর মন নিরমল ভয়া, জৈসা গঙ্গা নীর।
তব পাছৈ লাগা হরি ফিরৈ, কহত কবীর কবীর ॥৪৯॥

জীবন তৈঁ মরিবো ভলো, জো মরি জাঁনৈঁ কোই।
মরনৈঁ পহিলৈ জো মরৈ, তৌ কলি অজরাবর
হোই ॥৫০॥

কবীর হরদী পীয়রী, চূনাঁ উজল ভাই।
রাঁম সনেহী যুঁ মিলৈ, দোনউঁ বরন গঁবাই ॥৫১॥

হদ্দ চলৈ সো মানবা, বেহদ্দ চলৈ সো সাধ।
হদ বেহদ দোউ তজৈ, তাকর মতা অগাধ ॥৫২॥

হিন্দু মুআ রাঁম কহি, মুসলমাঁন খুদাই।
কহৈ কবীর সো জীবতা, জো দুইঁ কৈ নিকটিন
জাই ॥৫৩॥

কাবা ফিরি কাসী ভয়া, রাঁমহিঁ ভয়া রহীম।
মোট চূন মৈদা ভয়া, বৈঠী কবীরা জীম ॥৫৪॥

সেখ সবুরী বাহিরা, ক্যা হজ কাবৈ জাই।
জাকী দিল সাবিত নহীঁ তাকৌ কহাঁ খুদাই ॥৫৫॥

কাসী কাবৈঁ ঘর করৈ, পীবৈ নিরমল নীর।
মুকুতি নহীঁ হরি নাঁউ বিনু, যোঁ কহৈ দাস
কবীর ॥৫৬॥

সাঁঈ সেতী সাচ চলি, ঔরাঁ সোঁ সুধ ভাই।
ভাবৈ লাঁবৈ কেস করি, ভাবৈ ঘুরড়ি মুড়াই ॥৫৭॥

সাধু ভয়া তৌ ক্যা ভয়া, মালা মেলি চারি।
বাহরি চোলা হীগঁলা, ভীতর ভরী ভঁগারি ॥৫৮॥

কেসোঁ কহা বিগরিয়া, জে মুড়ৈ সৌ বার।
মন কোঁ কাহে না মুড়িয়ে, জামৈঁ বিখৈ বিকার ৫৯॥

সোঈ আখর সোই বৈঁন জন জু জু বাচবঁত।
কোঈ এক মেলৈ লবলি, অমীঁ রসাইন হঁত ॥৬০॥

পাঁনী হু তৈঁ পাতরা, ধুঁবাঁ হু তৈঁ ঝীন।
পবেনা বেগি উতাবলা, সো দোস্ত কবীরৈ কীন ॥৬১॥

কবীর ভলী মধুকরী, ভাঁতি ভাঁতি কৌ নাজ,।
দাবা কিসহী কা নহীঁ বিন বিল্লাইত বড় রাজ ॥৬২॥

চিন্তা ছাঁড়ি অচিঁত বহু, সাঈ হৈ সমরল্ল।
পসু পঁখেরু জীবজন্তু, তিনকী গাঠী কিসা গরল্ল ॥৬৩॥

রাঁম নাঁম সোঁ দিল মিনী, জম হঁম পরী বিরাই।
মোহিঁ ভরোসা ইষ্ট কা, বন্দা নরকি ন জায় ॥৬৪॥

গাবন হী মৈঁ রোজ হৈ, রোবন হী মৈঁ রাগ।
ইক বৈরাগী গ্রিহ করৈ, এক গ্রিহী বৈরাগ ॥৬৫॥

কবীর পঢ়িবা দূরি করি, পুসতগ দেহু বহাই।
বাবন অকিখর সোধিকৈ, ররৈ মমৈঁ চিত নাই ॥৬৬॥

সহজৈঁ সহজৈঁ সব গত্র, সুতঁ বিত কাঁমিনী কাঁম।
একমেক হোই মিলি রহা, দাস কবীরা রাম ॥৬৭॥

অর্থ ঃ—

সদ্‌গুরু আমাকে 'রামনাম' দিলেন। এই 'রামনামের' তুল্য এমন কিছুই আর আমার নেই যা দেওয়া চলে। কোন্ বস্তু দিয়ে আমি তাঁকে খুশি করতে পারব—এই আমার মনের সাধ দিনরাত ; কিন্তু এই সাধ আর পূর্ণ হল না ॥১॥

সদ্‌গুরুর মহিমা অপার। তিনি আমায় অশেষ কৃপা করেছেন। তিনি আমাকে অগণিত চক্ষু দিয়েছেন—আর দিয়েছেন অনন্ত দৃষ্টি, তাতেই আমি অন্তহীন প্রভুর দর্শন লাভ করি ॥২॥

যে চকোরী রাত্রিবেলা তার চকোরকে খুজে পায় নি। সেও রাত্রিশেষে এসে চকোরের সঙ্গে মিলিত হতে পারে ; কিন্তু যে রাম ভজনা করেনা, সে দিনে বা রাত্রিতে কোনো সময়েই তাঁকে পায়না ; অর্থাৎ সেই অভাজনের দুঃখ অনন্তকাল চলে ॥৩॥

হতাশের মতো কেবল 'বিরহ' 'বিরহ' বলছ কেন ! 'বিরহ' যে শাহেনশাহ ! যে দেহীর মনে 'বিরহ' ভাব জাগে না, তার তো চিরকাল শ্মশানেরই মতো অবস্থা ॥৪॥

পথ দেখে দেখে তো চোখে ছানি পড়ল। 'রাম' 'রাম' বলে বলে তো জিভের ছাল উঠে গেল ॥৫॥

চোখের জলের ঝরণা বয়ে চলছে, রাতদিন চাকার মতো ঘুরছি আর পাপিয়ার মতো 'পী-পী' রবে ডাকছি, 'হে রাম আমার ; কবে তুমি দেখা দেবে ?" ॥৬॥

অশ্রু তো সকলের চোখেই ঝরে ; সুজনের যেমন দুর্জনেরও তেমনি একই চোখের জল। কাঁদতে কাঁদতে যখন চোখ

দিয়ে জলের বদলে রক্ত ঝরবে তখনই বুঝবে যে তোমার হৃদয়ের প্রেম অকৃত্রিম ॥৭॥

কবীর বলছেন, শুয়ে শুয়ে কি লাভ হবে ; উঠে বসে কেন কেঁদে কেঁদে নিজের দুঃখের কথা বলছিস্ না ? কবরে যাকে যেতেই হবে, সে কেন এমন সুখে শুয়ে আছে ? ॥৮॥

তুমি তুমি করতে করতে তুমিই হয়ে গেলাম। আমাতে আর 'আমার' বলে কিছু রইল না। আমি তো নিজেকে তোমার নামেই সঁপে দিয়েছি। এখন যেদিকে তাকাই দেখি কেবল তুমি আর তুমি ॥৯॥

জ্ঞানী ভক্তের দুঃখ নিত্য লেগেই আছে, অজ্ঞানীরইতো রাজত্ব; কারণ পূর্বাপর বিচার বিবেচনাতো কিছু করেনা —কেবল উদরপূরণই উদ্দেশ্য ॥১০॥

বৈষ্ণব ভক্ত তো মসলীন বস্ত্র; তাতে ময়লা জমতে পায়না (কারণ সাবধানে রাখে, যত্রতত্র বিছায় না)। এর বিপরীত হল শাক্ত—যেন কালো কম্বল—যেখানে খুশি বিছিয়ে দিল ॥১১॥

এমন কেউই নেই যার আশ্রয় নেওয়া চলে ; কারণ সংসারে সবাইকেই নিজের নিজের আগুনে পুড়তে দেখেছি ॥১২॥

বেয়ারা আর বীর তো কতই পাওয়া যায়, কিন্তু বিরহী-ব্যথিতের দেখা পাওয়া যায় না। ব্যথিতের সঙ্গে ব্যথিতের যোগাযোগ হলে রাম-ভজন জমে ওঠে ॥১৩॥

মশাল হাতে নিয়ে আমি নিজের ঘর পুড়িয়ে দিয়েছি। এবার যে আমার সঙ্গ নেবে তার ঘর জ্বালাব ॥১৪॥

আমাতে আমার আপন কিছুই নেই, যা কিছু আছে সবই তোমার ; তোমার জিনিস তোমাকে সঁপে দিতে আমার কি আসে যায় ॥১৫॥

মৃগের নাভিতে কস্তুরী থাকে ; মৃগ তারই গন্ধে পাগল হয়ে বনে বনে ঘুরে মরে। ঠিক এমনিভাবে ঘটে ঘটে অর্থাৎ প্রতিটি দেহেই রাম রয়েছেন, কিন্তু দুনিয়ার লোক অজ্ঞানতা হেতু তাঁকে দেখতে পায় না ॥১৬॥

হে সখী, খুঁজতে খুঁজতে কবীর নিজেই খোয়া গেল। বিন্দু (জীবাত্মা) সিন্ধুতে (পরমাত্মা) মিলিয়ে গেল।—তাকে কি উপায়ে অন্বেষণ করি ? ॥১৭॥

দেহের ভিতরেই মন থেকে গেল এখন আর সে বাইরে কোথাও যায় না। জলন্ত আগুন নিবে গেল ; জ্বালা শীতল জলে রূপান্তরিত হল ॥১৮॥

কবীর বলছেন, দেহের ভিতরে বিনা তারেই ঝংকার উঠছে। বাইরে ভিতরে সেই নাদ ধ্বনিত হচ্ছে। এতে করে সকল সংশয় দূর হয়েছে ॥১৯॥

গঙ্গা-যমুনার (ইড়া-পিঙ্গলা) ভিতরে (সুষুম্নাতে) সহজ শূন্যের ঘাট ; সেখানে কবীরের মঠ ; সেই মঠে প্রবেশের পথের দিকে মুণিগণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন (অথাৎ এই স্থান মুনিদেরও দুর্লভ) ॥২০॥

যখনি আমি চোখ বুজব তখনি তুমি আমার চোখের ভিতরে এসো ; যাতে আমি আর কাউকে দেখতে না পাই, এবং তোমাকেও আর কেউ দেখতে না পায় ॥২১॥

নরকে যেতে তো আমি তৈরী হয়েই আছি ; তাতে আমি মোটেই ভয় পাইনা ; কারণ হে আমার প্রিয়তম, তোমাকে ছাড়া তো স্বর্গও আমার অবাঞ্ছিত ॥২২॥

হরি রসের মদিরা যে পান করেছে তার নেশার ঘোর

কিছুতেই কাটেনা ; ভক্তের দেহে বাহ্যজ্ঞান থাকেনা ; নামের নেশাতেই সে যে বিভোর ॥২৩॥

প্রেম বাগিচায় জন্মে না, প্রেম হাটবাজারে বিকায় না। রাজা বা প্রজা যার যখন প্রেমে রুচি হবে, নিজের মাথাটি দিয়ে প্রেম নিয়ে যাবে ॥২৪॥

কবীর বলছেন, দিন দশেক তো আপন সানাই বাজিয়ে নাও। তারপর আবার যখন এখানে ফিরে আসবে, তখন আর এই শহর আর এই গলি কিছুই দেখতে পাবেনা ॥২৫॥

কবীর বলছেন যে ধুলো জড় করে এই দেহের পুঁটুলি বাঁধা হয়েছে। চারদিনের এই খেলা—শেষে আবার যে মাটি সেই মাটি ॥২৬।

মনুষ্য জন্ম দুর্লভ। পাকা ফল গাছের ডাল থেকে পড়লে সে যেমন আর ডালের সঙ্গে জোড়া লাগে না ; মানবজন্মও তেমনি বার বার হয় না ॥২৭॥

কবীর বলেন যে অহংকার করা উচিত নয় ; কারণ কাল তোমার কেশ আকর্ষণ করেই রয়েছে—সে তোমাকে স্বদেশে না বিদেশে কোথায় যে আঁছড়ে মারবে—তা তো তুমি জান না ॥২৮॥

কবীর বলেন যে লাক্ষা দিয়ে তৈরি ঘরটি যে হীরা আর পদ্মরাগমণি দিয়ে মুড়িয়েছ এওতো চার দিনেরই খেলা, যে কোনো সময় পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তেমনি এই যে তোমার মানব শরীর, সেওতো ক্ষণিকেরই ব্যাপার—তবে তারজন্য এত সাজসজ্জার কি প্রয়োজন ॥২৯॥

যে গ্রাম ছেড়ে মানুষ চলে গেছে সেখানে শেষ পর্যন্ত রয়ে গেছে মাটির বাসনের ভাঙা টুকরো। যে কুমোর ঐ সব

মাটির বাসন গড়েছিল সে যে কবে গিয়েছে সে কথা কেউই জানেনা। শুধু কি তাই, লঙ্কার অধীশ্বর এমন যে রাবণ তাকেও তো চলে যেতে হয়েছে ॥৩০॥

আজ না হয় কাল না হয় পাঁচ দিনের দিন জঙ্গলে গিয়ে থাকতে হবে (সেখানেই তো কবর দেবে)। ঘাস খাবার জন্য পশুরা উপর দিয়ে ঘোরা ফেরা করবে ॥৩১॥

জোলা যখন কাপড়ের থান বুনতে থাকে তখন সুতোর অপর প্রান্ত বা খেইটিও ওর কাছে আসা যাওয়া করে ; মৃত্যুর সম্বন্ধেও একই হিসাব। যদি মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে চাও তাহলে এ সমস্ত ছেড়ে ছুড়ে পালাও ॥৩২॥

কাপড় বোনার সময় যতটা সুতো টাকুতে ভরা হয় ততটাই সুতোর আদি-অন্ত যা কিছু। টাকু যতবার চলে সুতোর অন্তিম প্রান্তটাও ততবারই কাছে আসে আর যায়। ঠিক একই ভাবে মানুষের পরমায়ুও নির্দিষ্ট এবং সীমিত। যতবার নিশ্বাস প্রশ্বাস চলছে ততবারই অন্তিম মুহূর্ত্তটিও কাছে আসছে আর যাচ্ছে। এজন্যই কবীরের উপদেশ এই যে জীবনে এমন কিছু করা চাই যাতে মৃত্যুভয় দূর হবে আর অমর হবার বাসনা জাগবে। কবীর বলেন যে গণ্ডীবদ্ধ আচার বিচারে যারা সংস্কারাচ্ছন্ন তাদের কাছে কোনো কথাই মুখ ফুটে বলার দরকার নেই ; বিন্দুমাত্র স্নেহ প্রদর্শনও ঠিক নয় ; কিন্তু যারা গণ্ডীর বাইরে আছে যাদের প্রাণমন খোলা তাদের কাছে প্রাণ খুলে কথা বলতে কোনো বাধা নেই ॥৩৩॥

চূন মাটি দিয়ে ঘর তো খুব রঙ করছ। ধ্বংস-দেবতার কানে খবরটা একবার পৌছলেই হল ; সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আসবেন আর ধূলিসাৎ করবেন তোমার এই রঙমহল। (এ-

কথা বলার তাৎপর্য এই যে এই নশ্বর সংসারে বড় বড় অট্টালিকাও ভেঙে পড়ে ; কাজেই এ-সমস্ত ক্ষণভঙ্গুর বস্তু গড়াতে কোনো সার্থকতা নেই। অমরতা লাভের জন্য মানুষকে আরও বড় কিছু কাজ করতে হবে।) ॥৩৪॥

কবীর বলেন যে এখন আর বাজনা বাজেনা ; কারণ যন্ত্রের সব তার ছিঁড়ে গিয়েছে (অর্থাৎ দেহ প্রাণহীন হওয়াতে সকলই শূন্যময়) ; যন্ত্রী না থাকলে যন্ত্র কি করবে—কেউ না বাজালে যন্ত্র তো নিজে থেকে বাজতে পারে না ! (অর্থাৎ যে-প্রাণ এই শরীরকে চালু রেখেছিল, সেই প্রাণই যদি চলে গেল তো নিষ্প্রাণ শরীর কি করবে ?) ॥৩৫॥

জাঁতা ঘুরছে দেখে কবীর এই ভেবে কাঁদতে লাগলেন যে এই দুখণ্ড পাথরের মাঝখানে পড়ে কিছুই আর অক্ষত রূপে বেরিয়ে আসতে পারছেনা। অর্থাৎ যেমন করে জাঁতার চাপে খাদ্য বস্তু পেষাই হয়, তেমনি করেই এই আকাশ আর মাটির মাঝখানে পড়ে মানুষও পেষাই হয়ে যাচ্ছে—অর্থাৎ জাগতিক পীড়নে মানুষ তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারছে না ॥৩৬॥

রে নির্বোধ মাছ। জেলে জাল ফেলেছে। এবার ধরা পড়বেই। অর্থাৎ মৃত্যু তোমাকে গ্রাস করবেই, হে জীব, পূজা-অর্চনা বা তুকতাক্ দিয়ে যমের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবেনা। যদি বাঁচতে চাও (অর্থাৎ অমরত্ব লাভের আকাঙ্খা থাকে) তবে অপার সমুদ্রে চলে যাও (অর্থাৎ পরমাত্মার শরণাপন্ন হও) ॥৩৭॥

লম্বা দেয়াল তুলে কার জন্য ঘর তৈরি করছ ? তোমার ঘর তো হবে মাত্র সাড়ে তিন হাত (কারণ মানব দেহের মাপতো এই)—বড় জোর পৌনে চার হাত করতে পারো ॥৩৮॥

যার যার সময় অনুসারে সকল প্রিয়জন আর বন্ধুবান্ধবই স্বর্গলাভ করেছেন। এবার তোমার পালা দিন দিন নিকট হয়ে আসছে। অর্থাৎ আমরা সকলেই মৃত্যুর করাল গ্রাসের অধীন —এই কথাটি মনে রেখে সৎকর্মে যেন নিয়োজিত হই ॥৩৯॥

জলের বুদ্‌বুদের মতোই ক্ষণস্থায়ী এই মনুষ্যজীবন। দেখতে না দেখতেই মিলিয়ে যায়—যেমন মিলিয়ে যায় দিনের বেলায় আকাশের তারা ॥৪০॥

মৃতের জন্য যারা কেঁদেছিল, তারাও মরে গেল। যে মৃত ব্যক্তিকে পুড়িয়েছিল, সেও মরে গেলে। যে 'হায়! হায়!' করে অন্যকে সান্তনা দিয়েছিল, সেও মরে গেল। তারপর আবারও তুমি কাঁদছ? (অর্থাৎ কে বেঁছে রয়েছে দেখাওতো?) ॥৪১॥

পথিক পথে দাঁড়িয়ে আছে, মৃত্যুও তার মুখোমুখি সম্মুখে দণ্ডায়মান। জীবনের সমস্ত করণকারণই মিথ্যা (অর্থাৎ নিজের কর্মের বোঝা মাথায় নিয়ে মুসাফিরের মতো মানুষ মরণের রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে) ॥৪২॥

যিনি আমাকে জন্ম দিয়েছিলেন, তিনি গত হলেন। আমিও এখন যাবার জন্য প্রস্তুত। আমার পরে আমার ছেলেপিলেরাও তল্‌পিতল্‌পা গুটোচ্ছে (অর্থাৎ সবাই একই পথের যাত্রী) ॥৪৩॥

কবীর বলেন, এই সংসার কিছুই নয় (এর কোনো নিশ্চিত রূপ নেই)। কখনও তিতা কখনও মিঠা। গতকাল যিনি ছিলেন এই মহালের একজন মান্যগণ্য মানুষ, তাঁকেই দেখা গেল আজ শ্মশানে ॥৪৪॥

পুত্রের জন্মদান করে কি এমন হল যে একেবারে আনন্দের জয়ঢাক বাজছে? এখানে আসা-যাওয়াতো পিঁপড়েদের মিছিলের মতোই চলছে অবিরাম অবিশ্রাম ॥৪৫॥

রাম-রূপী মহামূল্য মণি পেয়েছ তুমি হে কবীর, সাবধান, গিঁঠ খুলবেনা। ভালো করে বেঁধে রাখো। কারণ এমন কোনো নগর এখানে নেই, যার নাগরিক এই মণি কিনতে পারে, এমন কোনো জহুরী নেই, যে এই মণির ঠিক ঠিক মূল্য নিরূপণ করতে পারে, এমন কোনো খরিদ্দারও নেই যার কাছে এই মণি ক্রয় করার মতো অর্থ আছে ॥৪৬॥

সবজীর হাটে হীরা দেখবার দরকার নেই। নিজের আঁচলে শক্ত করে হীরার টুক্‌রোটি বেঁধে নাও তারপর চুপচাপ নিজের পথে চল। অর্থাৎ যোগ্যলোকের কাছেই জ্ঞানের কথা বলবে। সবজি বিক্রেতা আর হীরার মালিকের মধ্যে তফাৎ অনেকটা; কাজেই সবজিওয়ালা হীরার মূল্য কতটা অনুমান করতে পারবে? ॥৪৭॥

ম'রে ম'রে তো সংসারটাই শেষ হয়ে গেল; তবুও যথার্থ মরণকে কেউ জানল না। কবীরদাস এমন মৃত্যুই বরণ করলেন, যার পরে তাঁকে আর বার বার মরতে হবে না। এখানে কবীরের আধ্যাত্মিক মৃত্যু ও জাগতিক মৃত্যুর প্রভেদ সূচিত হয়েছে। প্রথমোক্ত আধ্যাত্মিক মৃত্যুর তাৎপর্য হল জীবন্মৃত অবস্থায় থাকা। এরকম মৃত্যু যাঁরা আয়ত্ত করেন তাঁদের জরামৃত্যু আর স্পর্শ করতে পারে না ॥৪৮॥

কবীর বলেন, মন যখন নির্মল হল গঙ্গাজলের মতো তখন ভগবান 'কবীর' 'কবীর' বলে আমার পিছনে ঘুরতে লাগলেন। অর্থাৎ মন নিষ্কলুষ হলে পরমাত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎকারতো হয়ই, তা ছাড়া ভক্তের সমস্ত চিন্তা বা দায় ভগবান নিজের কাঁধেই তুলে নেন ॥৪৯॥

জীবনের চেয়ে মরণই ভালো, অবশ্য যদি কেউ মরতে

জানে! দেহের মৃত্যুর আগেই যে-লোক নিজের মনকে মেরে ফেলতে পারে অর্থাৎ 'জীবন্মৃত' হতে পারে—সেই কলিযুগে অজর-অমর হয়ে থাকে ॥৫০॥

কবীর বলছেন যে হলুদের রঙ পাটকিলে, আর চূণের রঙ সাদা; কিন্তু যে জন্ম রামের স্নেহানুগত সে প্রেমের লালরঙে এমনভাবে মিশে যায় যে দুই রঙ অদৃশ্য হয়ে যায় ॥৫১॥

যে সীমাবদ্ধ সে সাধারণ মানুষ, সীমা অতিক্রম করে যাঁর আচরণ তিনি সাধু; কিন্তু যিনি সীমা এবং অসীম দুইই পরিত্যাগ করেন—তাঁরই মত আসলে অপরিসীম ॥৫২॥

হিন্দু 'রাম' 'রাম' বলতে বলতে মরল আর মুসলমান মরল 'খোদা' 'খোদা' বলতে বলতে। কবীর বলছেন যে জীবিত সেই আছে, যে এই দুয়ের কারও কাজেই ঘেঁষেনা ॥৫৩॥

কাবাই রূপান্তরিত হয়ে কাশী হয়েছে, রামই হয়েছে রহিম। মোটা আটা পিষিয়ে মিহি ময়দা হয়েছে; কবীর তাই বসে বসে খাচ্ছেন ॥৫৪॥

হে শেখজী, অসন্তোষ নিয়ে হজ করতে কাবা গিয়ে কি হবে? হৃদয় যার নির্দয় সে খোদাকে কোথায় পাবে? ॥৫৫॥

কাশীর কাছে ঘর কর আর গঙ্গার নির্মল জল যতই পান কর না কেন হরিকে স্মরণ না করলে মুক্তি পাবে না—কবীর এরূপই বলছেন ॥৫৬॥

প্রভুর (পরমাত্মার) সঙ্গে সদাচার করো, সহজ শুদ্ধভাবে থাকো অন্যদের সঙ্গে—তারপর ইচ্ছা হয়, চুল-দাড়ি লম্বা করো—অথবা সাফ করে মাথা মুড়িয়ে নাও ॥৫৭॥

সাধু হয়ে গেলে আর গোটাচারেক মালা গলায় ঝুলিয়ে নিলে কি হল লাভ তাতে? বাইরে ইঙ্গুদির রঙ

ভিতরে তো ভাগাড় অর্থাৎ 'মন না রাঙায়ে কাপড় রাঙালে যোগী' ॥৫৮॥

চুলে কি তোমার বিকার ধরেছে যে একশ বার মাথা মোড়াচ্ছ? তার চেয়ে মনকে মুড়িয়ে নাও (শুদ্ধ কর) কারণ মনেই তো বিষয়-বিকার ভরে আছে ॥৫৯॥

তিনিই অক্ষর (শব্দ), আর তিনিই বচন (বাক্য), কিন্তু সবাই তাঁকে ছাড়া ছাড়া ভাবে প্রকাশ করে। যদি কেউ তাঁর মধ্যে সুন্দরকে দেখিয়ে দিতে পারে—তাহলে সেই হয়ে ওঠে অমৃতরসায়ন ॥৬০॥

জলের চেয়ে লঘু, ধুঁয়ার চেয়ে সূক্ষ্ম, হাওয়ার চেয়ে বেগবান বা তেজপূর্ণ যে ব্রহ্ম তাঁকেই কবীর তাঁর বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন ॥৬১॥

কবীর বলছেন যে ভিক্ষান্নই ভালো, তাতে নানা রকমের অন্ন জোটে। তাতে কারও কর্তৃত্ব নেই। এ হল বিনাবিলায়তী রাজত্ব ॥৬২॥

চিন্তা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হও, প্রভু সব দেবেন। পশুপক্ষী আর জীবজন্তুর কি সম্বল আছে?

অর্থাৎ নিঃসম্বল পশুপক্ষীর লালনপালন যিনি করছেন তিনিই তোমাকেও দেখবেন ॥৬৩॥

রাম নামে হৃদয় মিলে গেল যাতে যমের আর আমার মাঝখানে একটা পরিখা সৃষ্টি হল। আমার তো গুরুই ভরসা—বন্দা নরকে যাবে না ॥৬৪॥

গানেতেই আমার কান্না লুকিয়েছে আর কান্নাতেই আমার গান লুকিয়েছে—এই ভাবেই কোনো বৈরাগী ঘর করে (সংসারী হয়), আবার কোনো সংসারী বৈরাগ্য বরণ করে ॥৬৫॥

কবীর বলছেন, পড়া ছেড়ে দাও আর পুস্তক ফেলে দাও। বর্ণমালার বাহান্নটি অক্ষরকে শোধন করে 'র' কার 'ম' কারে চিত্ত সমাহিত কর ॥৬৬॥

ধীরে ধীরে সবাই চলে গেল—পুত্র গেল, বিত্ত গেল, কামিনী গেল, কামনাও গেল ; অর্থাৎ সকল বাসনাই শেষ হয়ে গেল—এখন তো কবীর রামেতে 'একমেক' হয়ে মিশে রয়েছে।

বলার উদ্দেশ্য এই যে বিষয়-সংসারে যতখানি আসক্তি ছিল ততখানি নিরাসক্তি আসতে সকলই দূরে গেল, রামই এলেন কাছে। ভক্ত এবং ভগবানের মধ্যে আর কোনো দূরত্ব রইল না।

তুলসীদাস লিখেছেন—

কামিহি নারি পিয়ারি জিমি, লোভিহিঁ প্রিয় জিমি দামা।
তিমি রঘুনাথ নিরন্তর প্রিয় লাগহু মোহি রাম ॥

কবীর এবং তুলসী দু'জনেই সহজ অনুরক্তিতে যে গুরুত্ব দান করেছেন সেটা বিশেষভাবে ভাববার বিষয়। ভক্তিতত্ত্বের মূল রহস্যই এই। উদ্ধৃতাংশ রামচরিতমানসের সর্বশেষ দোহা যাতে উক্ত সীদ্ধান্তে তুলসীদাসের অনুরক্তির কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। কবীরেরও ভক্তিমার্গ একই রকমের—যাতে সকল বাসনা ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে হয়ে রামের জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়ে দিয়ে একেবারেই নিঃশেষ হয়ে যায় ॥৬৭॥

রাষ্ট্রীয় জীবন-চরিতমালা

সিরিজের পুস্তকাবলী

		মূল্য
১।	**গুরু গোবিন্দ সিং** (তৃতীয় সংস্করণ) —ডক্টর গোপাল সিং	২·০০
২।	**গুরু নানক** (২য় সংস্করণ)—ডক্টর গোপাল সিং	২·২৫
।	**কবীর**—ডক্টর পারসনাথ তিবারী	১·৭৫
৪।	**রহিম**—ডক্টর সমর বাহাদুর সিং	২·০০
৫।	**মহারাণা প্রতাপ** (হিন্দি)—শ্রী আর. এস. ভাট	১.৭৫
৬।	**অহল্যাবাঈ** (হিন্দি)—শ্রী হীরালাল শর্ম্মা	১·৭৫
৭।	**ত্যাগরাজা**—অধ্যাপক পি. শ্যামবোমূর্ত্তি	২·০০
৮।	**পণ্ডিত ভাটখণ্ডে**—ডক্টর এস. এন. রতনজানকর	১·২৫
৯।	**পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বর**—শ্রী এ. আর. আতাভালে	১·২৫
১০।	**শঙ্করাদেভ**—ডক্টর মহেশ্বর নিয়োগ	২·০০
১১।	**রাণী লক্ষ্মীবাঈ** (হিন্দি)—শ্রী বৃন্দাবন লাল ভর্ম্মা	১.৭৫
১২।	**সুব্রহ্মানীয়া ভারতী**—ডক্টর (মিসেস) প্রেমা নন্দকুমার	২·২৫
১৩।	**হর্ষ**—শ্রী ভি. ডি. গঙ্গাল	১·৭৫
১৪।	**সমুদ্রগুপ্ত** (হিন্দি)—ডক্টর লালনজী গোপাল	১·২৫
১৫।	**চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য** (হিন্দি)—ডক্টর লালনজী গোপাল	১·৫০
১৬।	**কাজী নজরুল ইসলাম**—শ্রী বসুধা চক্রবর্ত্তী	২·০০
১৭।	**শঙ্করাচার্য**—অধ্যাপক টি. এম. পি. মহাদেভন	২·০০
১৮।	**আমীর খশরু**—শ্রী সৈয়দ গোলাম শ্যামনানী	১·৭৫
১৯।	**নানা ফড়নবীশ**—ডক্টর ওয়াই. এন. দেওধর	১·৭৫
২০।	**রঞ্জিত সিং**—ডক্টর ডি. আর. সুদ	২·০০